কিছু সব ইস্পাতে তৈরি। পাহাড়ের চারিদিক ঘিরে নদী। একটা খুব সরু পথ দিয়ে দূর্গে যেতে হয়। পথটা এত সরু যে একজন লোক ঘোড়ায় চড়ে অতি কষ্টে যেতে পারে; তাও আবার এমনি পিছল যে কখন পড়ে গিয়ে প্রাণটা যায়।

এই আশ্চর্য্য মায়াদূর্গ বানিয়ে যাদুকর রোজারকে সেখানে নিয়ে রাখল। দূর্গে লোক জনের অভাব ছিল না—চাকর, বাকর, সিপাই শান্ত্রী সকলি ছিল, খাবার জিনিষ পত্রের ত কথাই নাই! এই মায়াদূর্গে থেকে রোজারের বাল্যকাল কেটে গেল, ক্রমে সে যখন বড় হয়ে উঠল তখন যাদুকর ভাবল—"তাইত! রোজার এখন বড় হয়েছে, সে রাজপরিবারের ছেলে—এখন ত তার উপযুক্ত সঙ্গী চাই!" সঙ্গীর অভাব রইল না। আট্‌লাণ্টিস্ মন্ত্রবলে রোজারের বয়সী নানা দেশের প্রসিদ্ধ যোদ্ধা এবং সুন্দরী মেয়েদের এনে মায়াদূর্গে তার সঙ্গী করে রাখল। দূর্গের ভিতরেই সকলে কয়েদীর মত বন্ধ থাকত, কিন্তু তাদের খাওয়া দাওয়া আমোদ প্রমোদের এমন চমৎকার বন্দোবস্ত ছিল যে তাদের দিনগুলি বেশ সুখেই কাটত।

এদিকে একজনের পর একজন করে যাদুকর কত সম্ভ্রান্ত লোকেদের যে মায়াদূর্গে আনতে লাগল তার সীমাই নাই! সম্রাট্ সার্লেমেনের সকলের চেয়ে বড় যোদ্ধা ছিল রোলাণ্ড্। একদিন এই রোলাণ্ডও হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে পড়ল। তখন প্রসিদ্ধ যোদ্ধারা দলবদ্ধ হয়ে প্রতিজ্ঞা করল যে মায়াদূর্গ নাশ করে সকলকে উদ্ধার করতেই হবে। কিন্তু মায়ামন্ত্রের কাছে বলবীরত্ব হার মেনে অনেকের প্রাণ গেল।

সম্ভ্রান্ত মাটাল্‌বেনো পরিবারের মেয়ে ব্রাডামাণ্ট শিশুকাল হতেই উত্তম যুদ্ধবিদ্যা শিখেছিলেন। কত বড় বড় যোদ্ধাকেও তাঁর কাছে হার মান্‌তে হতো। মায়াদূর্গের যাদুকরের অত্যাচারের কথা শুনে তিনি রাগে জ্বলে উঠ্‌লেন। তখনি বর্ম্ম পরে অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে শাদা ধপ্‌ধপে যুদ্ধের ঘোড়ায় চড়ে চল্লেন মায়াদূর্গের উদ্দেশে।

অনেকদূর গিয়ে দেখ্‌লেন একজন যোদ্ধা পথের ধারে বড় বিমর্ষ হয়ে বসে আছেন। তাঁর দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করলে পর তিনি বল্লেন—"আমি আমার স্ত্রীকে নিয়ে এ পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ কাল ঘোড়ায় চড়ে কাল চর্ম্ম পরা একজনলোক এসে আমার স্ত্রীকে নিয়েই শূন্যে চলে গেল। আমি চীৎকার করতে করতে পিছনে পিছনে ছুট্‌লাম বটে কিন্তু কোন লাভ হলো না—পরে জান্‌তে পারলাম মায়াদূর্গের সেই হতভাগা যাদুকরই আমার স্ত্রীকে চুরি করে পালিয়েছে।"

ব্রাডামাণ্ট বল্লেন—"মহাশয়! আপনি আপনার স্ত্রীকে উদ্ধার করবার কোন চেষ্টা করেননি কেন?"

"চেষ্টা করেছিলাম বটে কিন্তু দুর্গের সেই পিছল পথ পার হয় কার সাধ্য! কতবার যে চেষ্টা করেছি কিন্তু কোন মতে সে পথ পার হতে পারলাম না।"

ব্রাডামাণ্ট এই কথা শুনে বল্লেন—"আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলুন। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি সে দুষ্ট যাদুকরকে জব্দ করে সকলকে উদ্ধার করব।"

তখন সেই যোদ্ধা ঘোড়ায় চড়ে পথ দেখিয়ে চল্ল। ব্রাডামাণ্টর ঢালের মধ্যে যে চিহ্ন ছিল তা দেখে তাঁকে চিন্‌তে পেরে সেই দুষ্ট যোদ্ধার মনে বেজায় হিংসা হলো। পথে যেতে যেতে কেবলি সে ভাব্‌তে লাগল কি করে তাঁকে মেরে ফেলবে। ব্রাডামাণ্টির ক্ষমতা তার বেশ জানা ছিল সুতরাং বলপ্রয়োগ অসম্ভব—বিশ্বাসঘাতকতা না করলে কাজ উদ্ধার হবে না।

চারদিকে পাহাড়, রাস্তার আশে পাশে ভয়ঙ্কর সব গহ্বর। পথের ধারেই ভয়ানক গভীর অন্ধকার একটা গহ্বর দেখে দুষ্ট যোদ্ধটি বল্‌ল—"দেখুন! এই পথে যাবার সময় এই গহ্বরে কান্না শুনে আমি চেয়ে দেখেছিলাম ভারী সুন্দরী একটি মেয়ে গহ্বর থেকে উঠবার জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করছিল আর তখনি বিকট চেহারার একটা লোক তাকে টেনে নিয়ে গহ্বরের ভিতর ঢুকে পড়ল।"

এই কথা শুনে ব্রাডামাণ্ট বল্‌লেন—"সত্যি! তাহলে ত একবার সে মেয়েটিকে উদ্ধারের চেষ্টা না করে চলে যাওয়াটা বড় অন্যায় হবে।" এই বলে তিনি খুব লম্বা একটা গাছের ডাল কেটে এনে সেটাকে গহ্বরের ভিতর ঢুকিয়ে দিয়ে বল্লেন—"আপনি ডালটাকে শক্ত করে ধরে রাখুন আমি সেটা বেয়ে বেয়ে নীচে নেমে যাই।" ব্রাডামাণ্ট খানিকটা সবে নেমেছেন অমনি সেই হতভাগা ইচ্ছা ক'রে ডালটা ছেড়ে দিল, ব্রাডামাণ্টও একেবারে গহ্বরের তলায় পড়ে গেলেন। বিশ্বাসঘাতক লোকটা এইরূপে কার্য্য উদ্ধার করেই সেখান থেকে চম্পট।

সৌভাগ্য বশতঃ ব্রাডামাণ্ট মারা গেলেন না, খানিকক্ষণ পরে জ্ঞান হয়ে তিনি দেখলেন তাঁর বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই, হাত, পা, সব ঠিকই আছে। গহ্বরের তলায় আর একটা গর্ত্ত দেখা যাচ্ছে তার মুখেই একটা খোলা দরজা। সেই দরজা দিয়ে ঢুকে খানিক দূর গিয়েই দেখ্‌লেন গির্জার মতন দেখ্‌তে ভারী সুন্দর একটা প্রকাণ্ড কামরা, সবই পাহাড়ের গা কেটে বানান। হলের ঠিক মাঝখানে কাল মার্ব্বেল পাথরের

প্রকাণ্ড একটা বেদী, ঠিক তার উপরেই সোণার তৈরী একটা উজ্জ্বল আলো জ্বলছে—সমস্ত হলটাকে দিনের মত দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

ব্রাডামাণ্টি ভয়ানক আশ্চর্য্য হয়ে চারদিকে দেখ্‌ছিলেন এমন সময় একটি ছোট দরজা খুলে পরম সুন্দরী একটি মেয়ে এসে উপস্থিত। হলে এসেই তিনি বল্লেন—"ব্রাডামাণ্টি! তুমি এসেছ—ভারী সন্তুষ্ট হয়েছি। অনেক দিন থেকে আমরা অপেক্ষা করেছিলাম, কারণ তুমি যে এখানে আসবে তা তোমার জন্মের আগেই ভবিষ্যৎবাণী হয়েছিল।"

ব্রাডামাণ্টি একেবারে অবাক হ'য়ে বল্লেন—"আপনি কে? আমি এ কোথায় এসেছি?"

মেয়েটি বল্ল—"আমি যাদুকরী মেলিসা, আমি তোমার পরম বন্ধু। তুমি যে কাজে এসেছ আমা দ্বারা তার অনেক সুবিধা হবে। যাদুকরদের রাজা প্রসিদ্ধ মার্লিনের নাম শুনেছ? এটা হচ্ছে তাঁরই জীবন্ত সমাধি মন্দির। তিনি এই মন্দির তৈরী করে এখানেই যুগের পর যুগ ঘুমন্ত অবস্থায় রয়েছেন। কেউ যদি তার ভাগ্য জানতে চায় তিনি তখনি তার উত্তর দেন। তোমার নিশ্চয়ই খুব পরিশ্রম হয়েছে এবং ক্ষিদেও পেয়েছে এখন কিছু খেয়ে ঘুমিয়ে থাক। ভোরবেলা আমি তোমাকে সেই মায়াদূর্গের পথ দেখিয়ে দিব। কি করে তুমি তাকে জব্দ করে সকলকে উদ্ধার করবে তারও উপায় বলে দিব।"

পরের দিন ভোরবেলা মেলিসা একটা গুপ্ত পথ দিয়ে ব্রাডামাণ্টিকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। ভয়ানক পথ, আশে পাশে দুধারে ভয়ঙ্কর সব গহ্বর। অতি সাবধানে যেতে যেতে মেলিসা বল্‌তে লাগল,—"ব্রাডামাণ্টি! মায়াদূর্গ বড় সাংঘাতিক দূর্গ। ইস্পাতের তৈরী, মানুষের সাধ্য নাই যে যুদ্ধ করে সে দূর্গ জয় করে। কাল পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে যাদুকর ঘুরে বেড়ায়। তার একটা যাদুকরা আশ্চর্য্য ঢাল আছে সে ঢালের দিকে চাইবা মাত্র লোক অজ্ঞান হয়ে পড়ে।

এই যাদুকরের যাদু নষ্ট করবার একটি মাত্র জিনিষ আছে, সেটা হচ্ছে একটা আংটি। এই আংটি আগে আফ্রিকার রাজার কাছে ছিল, তাঁর কাছ থেকে একটা লোক সেটা চুরি করে নিয়েছে। এই আংটি উদ্ধার করতে পারলেই তুমি মায়া দূর্গ নষ্ট করতে পারবে। এখন সেই আংটিচোরকে কি করে পাবে তাও বল্‌ছি শোন। এই সাম্‌নের মাঠটা পার হয়ে সোজাপথে খানিক দূর গেলেই দেখতে পাবে একটা সরাইখানা। তার

সাম্‌নেই একটা চৌকির উপরে ভয়ানক বিদ্‌ঘুটে চেহারার একটা বাঁটুল লোক বসে আছে—সেই আংটিচোর, তার হাতেই আংটি আছে। যে রকমে পার আংটি উদ্ধার করা চাই—সাবধান! সে যেন তোমার মতলবটা বুঝতে না পারে।"

ব্রাডামাণ্টি এই কথা মত সরাইয়ের সামনে গিয়ে একটা লোককে দেখেই

বুঝতে পারলেন এ সেই আংটি চোর। তার আংঙ্গুলে প্রকাণ্ড বড় একটা হীরের আংটি। তখন তার সঙ্গে ব্রাডামাণ্টি গল্প জুড়ে দিলেন—নানা কথার পর বল্লেন,—"কেউ যদি আমাকে মায়া দূর্গের পথটা দেখিয়ে দিত! আমি প্রতিজ্ঞা করে বেরিয়েছি সেই দুষ্ট যাদুকরকে জব্দ করে সকলকে উদ্ধার করব।"

আংটিচোর সে কথা শুনে ভাবল যে যাদুকর আট্‌লাণ্টিসের হাতে ত এর মরণ নিশ্চয়। বাস্, তারপর মজা করে এর জিনিষ পত্র নিয়ে চম্পট দেওয়া যাবে। এই ভেবে সে বল্ল, "মহাশয়! এ সব জায়গার পথ ঘাট আমার বিলক্ষণ জানা আছে, চলুন! আমিই আপনাকে মায়া দূর্গে নিয়ে যাব।"

ব্রাডামাণ্টি তাকে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে তার সঙ্গে চল্লেন। পথ ক্রমে উঁচু হয়ে পাহাড়ের উপর উঠেছে, অনেক দূর গেলে পর মায়া দূর্গ দেখ্‌তে পাওয়া গেল।

ব্রাডামাণ্ট ভাবলেন—এই হচ্ছে আংটি উদ্ধারের সময়। কিন্তু ছোট্ট বাটুল একটা লোক তার হাতে কোন অস্ত্র নাই—তাকে মেরে ফেলাটা তাঁর কাছে ভাল লাগল না। তখন তিনি হঠাৎ ফিরেই চট্ করে তার দুটো হাত ধরে ফেলে চক্ষের নিমেষে আংটিটা কেড়ে নিয়ে নিজের আঙ্গুলে পরলেন। তারপর তাকে তারই ঘোড়ার লাগাম দিয়ে আচ্ছা করে বেঁধে বাস্, তিনি চল্লেন মায়া দূর্গে।

পাহাড়ের চারদিক ঘুরে সেই সরু পিছল পথ দিয়ে একেবারে পাহাড়ের উপরে উঠলেন—পিছল পথ মায়া আংটীর গুণে জব্দ হয়ে গেল। পাহাড়ের উপর উঠে দূর্গের দরজায় যে শিঙ্গা ঝুলান ছিল সেটা নিয়ে এমন জোরে ফুঁক্‌লেন যে পাহাড়, বন, প্রান্তর, দূর্গ সমস্ত থর থর করে কেঁপে উঠল।

শিঙ্গা ফুক্‌বা মাত্র সেই কাল পক্ষীরাজ ঘোড়া, পিঠে তার কাল বর্ম্ম পরা সোয়ার, দূর্গের ভিতর থেকে লাফিয়ে এসে ব্রাডামাণ্টির মাথার উপরে শূন্যে ঘুরে বেড়াতে লাগল। যাদুকর সোয়ারের হাতে কোন অস্ত্র নাই, এক হাতে তার সেই দারুণ ঢালটি বেগুনি রেশম দিয়ে ঢাকা অন্য হাতে তার যাদুর পুঁথি তা দেখে বিড় বিড় করে সে মন্ত্র পড়ছে।

ব্রাডামাণ্ট এসব গ্রাহ্যও করলেন না। মায়া দূর্গের যাদুকর তখন হঠাৎ ঢালের ঢাকনা খুলে দিয়ে উজ্জ্বল চক্‌চকে ঢাল একেবারে ব্রাডামাণ্টির মুখের সামনে ধরে দিল। আংটির গুণে অবশ্যি তাঁর কোন অনিষ্ট হলো না কিন্তু তবু ব্রাডামাণ্ট চালাকি করে হঠাৎ মাটিতে পড়ে গেলেন—যেন সত্যি সত্যি তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন।

তখন যাদুকরের কি যে আহ্লাদ! শিকল নিয়ে ছুটে এসে ব্রাডামাণ্টকে উপুড় হয়ে দেখ্‌তে লাগল। যাই উপুড় হওয়া অমনি বজ্রমুষ্টিতে ব্রাডামাণ্ট তার হাত ধরে ফেল্লেন, তারপর তারই শিকল দিয়ে তাকে আচ্ছা ক'রে বাঁধলেন।

তাকে বেঁধেই তলোয়ার হাতে নিয়ে তার টুপি খুলে দেখলেন—ধীর গম্ভীর বৃদ্ধের চেহারা!

ব্রাডামাণ্টির প্রাণে মায়া হলো, তিনি বল্লেন—"আপনার মত বৃদ্ধকে মারা গুরুতর অন্যায়। কিন্তু আপনার মায়া দূর্গ আমি নষ্ট করে সমস্ত কয়েদীদের উদ্ধার করব।" এই ব'লে তিনি যাদুর আংটিটি তার চোখের সামনে ধরলেন। তৎক্ষণাৎ সাপের মাথায় যেন ধূলো পড়ল—আট্‌লাণ্টিস্ সকলকে উদ্ধার করে দিল, মায়াদূর্গ চক্ষের

নিমেষে হঠাৎ কোথায় মিশিয়ে গেল—সঙ্গে সঙ্গে আট্‌লাণ্টিস্‌ও একেবারে অন্তর্ধান—কেহ কোন দিন আর তার ছায়াটিও দেখতে পায় নি।

তারপর সকলে মহা খুসী হ'য়ে কোলাহল করতে লাগল, ব্রাডামাণ্টর সঙ্গে রোজারের বিয়ে হয়ে গেল, আর দেশ বিদেশে জয়জয়কার প'ড়ে গেল।

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়।

পুরাতন লেখা।

(৺উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী লিখিত)

(১) পাল্‌কী বেহারা।

পুরীতে একটা বড় রাস্তার পাশেই আমার বাসা ছিল, আর সেই রাস্তার সংলগ্ন একটি ঘরে দিনের বেলায় আমি বসিতাম। সুতরাং উড়ে পাল্‌কী বেহারার সঙ্গীত শুনিতে আমার ত্রুটি হয় নাই। এখানকার উড়েরা তেমন গান গাহিতে জানেই না। সেখানে কোন স্থান দিয়া একটা পাল্‌কী গেলে সিকি মাইল পর্য্যন্ত তাহাদের আক্ষেপ শুনিতে পাওয়া যায়। মনে হয়, যেন তাহারা বড়ই বিপদে পড়িয়াছে, আর সেই বিপদটা যেন তাহাদের পাল্‌কীর ভিতরে। কেহ কেহ বলিয়াছেন, যে সওয়ারী ভারি হইলে নাকি ঐরূপ করিয়া তাহারা তাহাকে গালি দেয়। ইহা যদি সত্য হয়, তবে বলিতে হইবে যে পাল্‌কীতে উঠিবামাত্র সকলেই হঠাৎ ভয়ানক ভারি হইয়া যায়। আসল কথা কিন্তু তাহার কিছুই নহে। উহাদের ঐ চীৎকারের ভিতরে একটা শৃঙ্খলা আছে। সামনের এক জন যেন চ্যাঁচাইয়া বলিল, "ওরে বাবারে!" পিছনের একজন যেন উত্তর দিল "কি হ'লোরে!" সামনের লোক বলিল "ওগো মাগো!" পিছনের লোক বলিল "কোথা যাব গো!" 'মাগো' 'বাবা গো' বলে, না আর কিছু যে বলে, তাহাও আমি জানি না, কথাগুলি নাকি বড়ই উর্দ্ধশ্বাসে বলে তাহাতেই ঐরূপ মনে হয়। উহাতে বেশ একটা ছন্দ আছে, তাহাতে মনে হয়, যে এক সঙ্গে পা ফেলিবার সুবিধার জন্য ঐরূপ করে, কারণ এক সঙ্গে পা ফেলিয়া চলাতে সওয়ারির আরাম আছে। অনেক সময় এরূপ বুঝা যায়, যে সামনের ব্যক্তি সর্দ্দার, সে ঐ উপায়ে চলার সম্বন্ধে উপদেশ দেয়। আসল কথাটা যে কি, তাহা উহারাই বলিতে পারে।

(২) সমুদ্রে স্নান।

সমুদ্রে নামিয়া স্নান করিতে গেলেই উহার ঢেউয়ের অত্যাচার সহ্য করিতে হয়। এই অত্যাচারটি এমন বিধিপূর্ব্বক হইয়া থাকে, যে একবার উহার আস্বাদন পাইলে আর কখনও তাহা ভুলিতে পারা যায়না। ইহাতে আমোদ যথেষ্ট আছে, উপকারও আছে, আবার আশঙ্কাও আছে। ঢেউয়ের বাড়িতে অনেকে গুরুতর আঘাত পায়, এমন কি অনেকের মৃত্যু হয়। অনেক সময় কোন হতভাগ্য লোক ঢেউয়ের টানে পড়িয়া জন্মের মত অদৃশ্য হয়।

অবশ্য এরূপ দুর্ঘটনা অনেক সময় অসতর্কতা আর সাঁতার না জানার দরুণই ঘটিয়া থাকে। ঢেউয়ের সঙ্গে লড়িতে গেলে তাহার আঘাত ত লাগিবেই। তাহার সামনে বেকুবের মতন শরীর পাতিয়া দিলেও বিপদের আশঙ্কা আছে। ঢেউ আসিয়া উপস্থিত হইলে তাহাকে বাম পাশ এবং ঘাড় পাতিয়া লইতে হয়। লাফাইতে আপত্তি না থাকিলে ঢেউয়ের সঙ্গে সঙ্গে লাফাইয়া শরীরকে উহার সমান উঁচু রাখিতে পারিলেও ছোট ছোট ঢেউয়ের সময় কাজ চলিয়া যায়। বড় ঢেউ হইলে ডুব দিয়া উহার নীচে চলিয়া যাওয়াই যুক্তি সঙ্গত। যাহারা সাঁতার জানে না, তাহাদের জলে না নামাই ভাল। সাঁতার না জানিয়া জলে নামার বিপদ এই, যে, অল্প জলও অনেক সময় হঠাৎ অধিক জল হইয়া যায়। তখন সাঁতার ভিন্ন আত্মরক্ষার উপায় থাকে না। তাহা ছাড়া হাজার সতর্ক হইলেও নাড়া চাড়ার হাত এড়াইবার সাধ্য নাই। বড় বড় ঢেউ এক একটা এমন আসে, যে তাহার সামনে আর কিছুতেই গাম্ভীর্য্য রক্ষা করা যায় না। সে আসিয়া তোমাকে লাটিমের মতন ঘুরাইয়া দিবে, ময়দার মতন থাসিয়া দিবে, তোমার অতিশয় গম্ভীর মুখখানি কখন হাঁ করিয়া ফেলিবে, তাহা তুমি টেরও পাইবে না; ততক্ষণে সের খানেক লোণা জল তোমার উদরস্থ হইয়া অন্ততঃ কয়েক ঘণ্টার জন্য তোমার মনের শান্তি নষ্ট করিয়া ফেলিবে।

কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে "যদি এমনি হয়, তবে সে কাজ করিতে যাওয়া কেন?" ইহার উত্তরে অনেক কথা বলা যায়।

প্রথমতঃ যে পুণ্য করিতে আসিয়াছে, সে লাঞ্ছনার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে। তাহার পুণ্য চাই; লাঞ্ছনা হইলে তাহাতে বরং পুণ্যের দাম বাড়িবে।

স্বাস্থ্যের জন্য যে আসিয়াছে সে অবশ্য জল বাড়ীতে লইয়া গিয়া তাহাতে স্নান করিতে পারে; কিন্তু তাহাতে উপকার কম। ঐ নাড়া চাড়ায় উপকার বেশী।

আর ঐ লাঞ্ছনার জন্যই যে আসিয়াছে, তাহাকে ওরূপ প্রশ্ন করা ত স্পষ্টই অনাবশ্যক বোধ হইতেছে। ঐ লাঞ্ছনার ভিতরে ভারি একটা আমোদ আছে। চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসরের বুড়ারা ঐ জলে পড়িয়া নাকাল হয়, আবার চ্যাঁচাইয়া হাসেও। ঢেউয়ের পর ঢেউ মাথার উপর দিয়া যাইতেছে; শরীরটাকে ধোপার বাড়ী দিবার ফল অনেকক্ষণ যাবৎ হইয়া গেছে; তথাপি তাহারা উঠিতে চাহে না। তাহার কারণ এই, যে এই নাড়াচাড়াতে তাহাদের শরীর মনে এমন একটা স্ফূর্ত্তি আনিয়া দিতেছে, যে অতি অল্প অবস্থায়ই তাহা লাভ করা যাইতে পারে।

আমি জানি, অনেকে ইহার উল্টা কথা বলেন। সমুদ্রে স্নান করিলে নাকি তাঁহাদের গা চট্ চট্ করে আর চুলে নাকে মুখে কাণে বালি ঢোকে, কাজেই সমুদ্রে স্নান সারিয়া আবার ঘরে আসিয়া তাঁহাদের পরিষ্কার জলে গা ধুইতে হয়। হইতে পারে; কিন্তু আমি ওরূপ কোন অসুবিধা ভোগ করি নাই, আর তাঁহাদের কেন যে ওরূপ হয়, তাহারও একটি ভিন্ন অন্য কারণ খুঁজিয়া পাই নাই।

সে কারণটি এই। অনেকে হয়ত সাঁতার জানেন না, অথবা জানিলেও হয়ত তাঁহারা খুব সতর্ক লোক, অধিক জলে নামিতে ইচ্ছা করেন না। ইঁহারা, যেখানে কোমর জলের বেশী হয় না, এইরূপ জায়গায় দাঁড়াইয়া স্নান করেন। ঢেউ যখন আসে, তখন ওখানে ঐ পরিমাণ জল হয়; কিন্তু ঢেউ চলিয়া গেলে সে স্থান একেবারেই শুকাইয়া যায়। এরূপ করাতে আশঙ্কার কারণ খুবই কম; কারণ কোমর জলে যে ডুবিয়া মরিবে, তাহার ডাঙ্গাতেই আর ভরসা কি? আমি অনেককে ঐরূপ করিতে দেখিয়াছি, আর তাঁহাদের দুর্দ্দশাও দেখিয়াছি। ঢেউ আসিয়া অনেক দূর অবধি ডুবাইয়া ফেলিল, আবার হটিয়া গিয়া অনেকটা স্থান খালি করিয়া দিল। তখন ঐ খালি জায়গায় গিয়া একজন দাঁড়াইলেন। সে সময়ে তাঁহার চেহারা ঠিক্ পালোয়ানের মতন। ঢেউ আসিয়া উপস্থিত! তাহার ফলে মুহূর্ত্তের মধ্যে সেই চেহারা আগে খুব ওস্তাদ বাজীকরের মতন, তার পরে উল্টান কচ্ছপের মতন হইয়া গেল! ঢেউ ততক্ষণে চলিয়া গিয়াছে, আর স্নানের সখও এক প্রকার মিটিয়াছে; এখন এই সুযোগে ডাঙ্গায় উঠিয়া আসিতে পারিলে হয়। কিন্তু উঠিবার চেষ্টায় কচ্ছপের অবস্থা হইতে প্রথমে ব্যাঙের, তার পরে হাতীর অবস্থায় আসিতে না আসিতেই পিছন হইতে আর এক ঢেউ আসিয়া তাঁহাকে আগে কুমীরের মতন করিয়া ফেলিল, শেষে কলা গাছের মতন করিয়া কূলের কাছে রাখিয়া গেল। সেখান হইতে নিতান্ত ঝড়ের কাকের মতন অবস্থায় ডাঙ্গায় উঠিয়া আসিলেন।

বাড়ী আসিয়া ইঁহার কয় কলসী পরিষ্কার জলের দরকার হইয়াছিল, তাহা জানি না। যাহা হউক, তাহাতে নাকের মুখের আর কাণের বালি অনেক পরিমাণে দূর হইলেও, আর চুলের বালি খানিকটা কমিলেও, পেটের ভিতরে যে বালি ঢুকিয়াছিল, তাহার যে কিছু হয় নাই, একথা নিশ্চয়। বিচারে যত দোষ, সব অবশ্য ঐ সমুদ্রস্নানেরই সাব্যস্ত হইয়াছিল! ডাঙ্গার কাছের ঘোলা জল আর বালিতে যাহারা স্নান করে, তাহাদের কতকটা এইরূপ দশা হয়। ভিতরকার জল পরিষ্কার, সেখানে স্নান করিলে এসকল অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। যাহা হউক, একথা স্বীকার করিতে হয়, যে ধারের বালিতে লুট্‌পাট্ হওয়ার ভিতরেও অনেককে যথেষ্ট আমোদ পাইতে দেখিয়াছি। যাঁহার বর্ণনা উপরে দেওয়া হইয়াছে, তিনি ঐ দুর্দ্দশার ভিতরেও প্রাণ খুলিয়া হাসিয়াছিলেন।

মাটির বাসন।

মাটির বাসন গড়িতে জানে না, এমন জাতি পৃথিবীতে খুব কমই আছে। নিতান্ত অসভ্য মানুষ যাহারা কাপড় পরিতে জানে না, যাহারা বনে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহাদের মধ্যেও মাটির বাসনের চল আছে। অতি প্রাচীন কালের মানুষ, যাহারা পাথর শানাইয়া অস্ত্র গড়িত, যাহারা ধাতুর ব্যবহার শিখে নাই, তাহাদের কবর খুঁড়িলে মাটির গেলাস ঘটি বাটি পাওয়া। কেবল তাহাই নয়, এক একটা জিনিষের উপর তাহারা নানারূপ কারুকার্য্য করিয়া তাহাদের সৌন্দর্য্যবোধের যে পরিচয় রাখিয়া গিয়াছে, এখনও পর্য্যন্ত তাহার চিহ্ন মাঝে মাঝে দেখিতে পাই। যাহারা আগুনের ব্যবহার করিতে জানিত না, তাহারা মাটির বাসন গড়িয়া রোদে শুকাইয়া লইয়া নিশ্চিন্ত থাকিত; কোন কোন স্থলে বাঁশের বা পাতার ঝুড়ি বানাইয়া তাহার গায়ে মাটি লেপিয়া বাসন বানান হইত, এরূপও দেখা গিয়াছে।

দশ হাজার বৎসর আগে ইজিপ্টদেশে যে মাটির বাসন তৈয়ারি হইত, তাহার সুন্দর সুন্দর নমুনা পাওয়া গিয়াছে। বাসনগুলি সমস্তই হাতে গড়া, কারণ, কুমারের চাকে মাটি গড়িবার কায়দা সে সময়ে তাহাদের জানা ছিল না। কিন্তু একাজে তাহাদের হাত এমন সাফাই ছিল, যে বড় বড় জালার মত পাত্রগুলির গড়নেও কোথাও খুঁৎ ধরিবার যো নাই। বড় বড় জাহাজী নৌকা করিয়া এই সকল বাসন দেশ বিদেশে

চালান হইত এবং তখনকার লোকে আগ্রহ করিয়া তাহা কিনিত। বাসনগুলির উপর চক্‌চকে কালো পালিশ থাকিত, তাহার গায়ে সাদা রঙের কারুকার্য্য।

মাটির বাসন নানা রকমের। সাধারণ "মেটে বাসন," যাহা অল্প আঁচে পোড়াইলেই চলে, আমাদের দেশে তাহার কিছুমাত্র অভাব নাই। গেলাস, ভাঁড়, সরা, মালসা হইতে আরম্ভ করিয়া কুঁজা কলসী জালা পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই দেখিতে পাইবে। কিন্তু "সাধারণ মাটির" জিনিষও যে কতদূর সুন্দর হইতে পারে, অতি প্রাচীনকাল হইতেই নানা দেশের লোকে নানা ভাবে তাহা দেখাইয়া আসিতেছে।

আর এক রকম মাটির জিনিষ হয়, তাহাকে পাথুরে মাটি বলা যায়। এগুলিকে কড়া আগুণে পোড়াইলে পাথরের মত মজবুৎ হয় এবং তখন তাহাকে অসংখ্য প্রকার দরকারী কাজে লাগান যায়। বাড়ী বানাইবার টালি ড্রেনের পাইপ নানারূপ খেলনা প্রভৃতি কত জিনিষ তৈয়ারি হয়। তাহাতে আবার নানা রকম রং দেওয়া ও ইচ্ছামত পালিশ ধরান চলে।

সাদা মাটির বাসন হইলেই আমরা অনেক সময়ে তাহাকে "চীনে মাটি" বলি—কিন্তু আসল চীনামাটি অতি উঁচু দরের জিনিষ। চীনে মাটির বাসন এক সময়ে কেবল চীনদেশেই তৈয়ারি হইত। প্রায় সাত শত বৎসর আগে মুসলমান সম্রাট সালাদিনের কাছে চীন সম্রাট কতগুলা উপহার পাঠাইয়াছিলেন, তাহার মধ্যে কতগুলা চীনা বাসন ছিল। তেমন বাসন কেহ চক্ষে দেখে নাই। পাৎলা ঝিনুকের মত স্বচ্ছ, ডিমের খোলার মত হাল্কা, সে আশ্চর্য্য বাসনের কথা চারিদিকে রটিয়া গেল।

এই চীনা বাসনের সঙ্কেত শিখিবার জন্য ছয় শতাব্দী ধরিয়া কত লোকে যে কত রকম চেষ্টা করিয়াছে তাহার আর অন্ত নাই। এই একটি বিদ্যাকে আয়ত্ত করিবার চেষ্টায় কত লোকে জীবনপাত করিয়াছে—এবং তাহার ফলে কেবল এইটুকু মাত্র জ্ঞানলাভ করিয়াছে যে অমন পাৎলা স্বচ্ছ সুন্দর জিনিষ করা একেবারেই সহজ নয়। জিনিষটা পাৎলা হয়ত স্বচ্ছ হয় না, স্বচ্ছ যদি হয় তবে এমন "ঠুন্‌কো" যে একটু ধরিতে গেলেই ভাঙ্গিয়া যায়! হয়ত আর সবই ঠিক হইল কিন্তু উপরের মোলায়েম পালিশটুকু ধরিল না, হয়ত কোথায় একটি চুল বা এক কণা বালি ছিল কিম্বা চুল্লীর আঁচ ঠিক সমান ছিল না, তাহাতেই বাসনটি পোড়াইবার সময় ফাটিয়া গেল। এই রকম করিয়া লোকে হাজারবার ঠেকিয়া ঠেকিয়া তবে এ বিদ্যা শিখিয়াছে।

গ্রীস প্রভৃতি দেশে এক সময়ে অতি সুন্দর মাটির ঘড়া ও ফুলদানি তৈয়ারি হইত কিন্তু গ্রীক ও রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংস হইবার পর এই শিল্প নষ্ট হইয়া যায়। ইহার পর বহু বৎসর পর্য্যন্ত ইউরোপে মাটির জিনিষ বলিতে সাধারণ মোটা বাসন পত্রই বুঝিত। তারপর মুসলমানদের দৌলতে যখন এই লুপ্ত শিল্প আবার জাগিয়া উঠে, তখন হইতে দক্ষিণ ইউরোপে, বিশেষতঃ ইটালিতে, নানারূপ শিল্পের বাসন দেখা দিতে লাগিল। তখনও তাহারা চীনা মাটি গড়িতে পারে নাই বটে কিন্তু মাটির উপর সাদা পালিশ চড়াইয়া তাহার চমৎকার নকল করিতে শিখিয়াছিল। বহুদিন পর্য্যন্ত এই ব্যবসায় ইটালির একচেটিয়া ছিল।

যাহাদের চেষ্টায় ও যত্নে এই শিল্পের ব্যবসায় ইউরোপের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, তাহাদের মধ্যে প্যালিসির নাম বিশেষভাবে করা যায়। বার্ণার্ড প্যালিসির বাড়ী ছিল ফ্রান্স দেশে। সেখানে ছবি আঁকিয়া, কাচ রঙাইয়া ও জরীপের কাজে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাঁহার দিন যাইত। হয়ত এই ভাবেই তাঁহার সারা জীবন কাটিয়া যাইত; কিন্তু একদিন তিনি একখানা "মাটি"র পেয়ালা দেখিলেন, তেমন জিনিষ আর তিনি কখনও দেখেন নাই—বিশেষত

তার পর যে পালিশ করা এনামেলের কাজ ছিল, তাহাতেই প্যালিসিকে একেবারে মুগ্ধ করিয়া ফেলিল। প্যালিসি তখন একেবারে প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলেন, ঐ রকম পালিশের সঙ্কেত না শিখিয়া তিনি ছাড়িবেন না।

সেই দিন হইতে তাঁহার আর অন্য চিন্তা নাই, জীবনের আর কোন কাজ নাই, তিনি কেবল চুল্লী জ্বালাইয়া ভাঙা পাথর আর মাটির মশলা গলাইতেছেন, আর দেখিতেছেন পালিশ ঠিক হইল কিনা। নিজে লেখাপড়া জানেন না, কোনদিন এ ব্যবসা শিখেন নাই, অথচ উৎসাহের তাড়নায় শক্তি সময় ও অর্থ অজস্র ঢালিয়া দিতেছেন—তাহাতে কি যে লাভ হইবে তাহা কেহই বোঝে না। লোকে পাগল বলিতে লাগিল, তাঁহার স্ত্রী বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, বাড়ীর লোকে অস্থির হইয়া পড়িল, কিন্তু তাঁহার সে দিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র নাই। দুই বৎসর হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর তিন শত মাটির পেয়ালা গড়িয়া তাহার উপর নানারকম মশলার প্রলেপ দিয়া তিনি চুল্লীতে চড়াইলেন। চুল্লী জুড়াইলে পর দেখা গেল একটি মাত্র বাসনের গায়ে অতি চমৎকার সাদা পালিশ ধরিয়াছে! তখন প্যালিসির আনন্দ দেখে কে!

এতদিন পর্য্যন্ত তিনি চারি ক্রোশ পথ হাঁটিয়া এক ব্যবসায়ীর চুল্লীতে তাঁহার জিনিষগুলা পোড়াইয়া আনিতেন। এখন হইতে তিনি নিজের বাড়ীতে একটি চুল্লী বানাইতে সঙ্কল্প করিলেন। ইটের পাঁজায় ইট কিনিয়া তিনি নিজে তাহা বহিয়া আনিতেন, এবং আপনার হাতে সাজাইয়া চুল্লী গড়িতেন। তারপর, চুল্লী খাড়া হইলে, তিনি অনেক কাঠ ও কয়লা সংগ্রহ করিয়া চুল্লী জ্বালাইলেন এবং একশত মাটির বাসন বসাইয়া তাহাতে মশলা চড়াইলেন —এই মশলা গলিলে পর বাসনে এনামেলের মত সাদা পালিশ হইবে। কিন্তু মশলা আর গলিতে চায় না! সারারাত কাটিয়া গেল, তারপর দিন গেল রাত গেল, এমনি করিয়া ছয় দিন ছয় রাত্র চুল্লীর পাশে বসিয়া বৃথায় কাটিল। তখন প্যালিসি নূতন মশলা বানাইয়া আবার আগুন চড়াইলেন। প্যালিসির তখন আর দিক্ বিদিক্ জ্ঞান নাই। তিনি আহার নিদ্রা ছাড়িয়া কেবল চুল্লীতে কাঠ যোগাইতেছেন। ক্রমে কাঠ সব ফুরাইয়া আসিল—তিনি বাগানের কাঠের বেড়া ভাঙিয়া আগুনে দিলেন। তাহাও যখন ফুরাইয়া আসিল তখন বাড়ীর টেবিল চেয়ার যাহা সম্মুখে পাইলেন, সব ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া জ্বালানি কাঠ করিতে লাগিলেন। এদিকে তাঁহার স্ত্রী পুত্র পরিবার সকলে কাঁদিতে কাঁদিতে সহরের মধ্যে ছুটিয়া বাহির হইয়াছে, আর সকলকে ডাকিয়া বলিতেছে যে প্যালিসি পাগল হইয়া বাড়ীঘর ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছেন। শুনিয়া সকলে ব্যস্ত হইয়া দেখিতে আসিল,

ব্যাপারখানা কি। ততক্ষণে প্যালিসির মশলা গলিয়া চমৎকার সাদা পালিশ হইয়া ফুটিয়াছে—তিনি অতি যত্নে সেগুলিকে ঠাণ্ডা করিয়া বাহির করিতেছেন।

প্যালিসি স্থির করিলেন তিনি তাঁহার আবিষ্কারকে ব্যবসায়ে লাগাইবেন। এক কুমারের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া তিনি ছয় মাসে তাহাকে দিয়া কতগুলি সুন্দর সুন্দর বাসন গড়াইলেন। কিন্তু সেগুলিতে পালিশ ধরাইবার সময় তাঁহার চুল্লী ফাটিয়া ধূলা ও ঝুল পড়িয়া তাঁহার চমৎকার পালিশ করা বাসনগুলিতে দাগ ধরাইয়া দিল। প্যালিসি কিছু বলিলেন না—বাসনগুলি ভাঙিয়া আবার চুল্লী মেরামত করিতে লাগিলেন। তাঁহার সে ধৈর্য্য আর বীরত্বের আর তুলনা হয় না। খোলা বাগানে সারাদিন রোদে ঘামিয়া বৃষ্টিতে ভিজিয়া তিনি চুল্লীর তদ্বির করিতেন; বাড়ীর বাহির হইলে লোকে তাঁহাকে দেখিয়া হাসাহাসি করিত; সারাদিন পরিশ্রমের পর যখন তাঁহার শরীর মন অবসন্ন হইয়া আসিত, তিনি বাড়ীতে ঢুকিবামাত্র চারিদিক হইতে সকলে ঠাট্টা বিদ্রূপ নিন্দা ও অভিযোগ করিত। এত রকম অশান্তির মধ্যে ষোল বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া প্যালিসি আপনার ব্যবসায়কে সফল করিয়া রাজসম্মান লাভ করেন। কিন্তু এখানেও তাঁহার দুঃখের শেষ হয় নাই। ব্যবসায়ে কৃতকার্য্য হইবার পরেও শেষ বয়স পর্য্যন্ত তাঁহাকে নানা শত্রুর হাতে অনেক অত্যাচার সহিতে হইয়াছিল। সে সকল অত্যাচার তিনি যেরূপ তেজের সহিত সহ্য করিয়াছিলেন, তাহা প্যালিসির মত বীরেরই উপযুক্ত। সকল বিষয়ে তিনি যাহা সত্য বুঝিতেন, নির্ভীক ভাবে তাহা প্রচার করিতেন; এই জন্য তাঁহার নিজের স্বাধীন ধর্ম্মমত বজায় রাখিতে গিয়া তিনি নানা রকমে লাঞ্ছিত হন এবং অবশেষে আশি বৎসর বয়সে মৃত্যুভয়কে অগ্রাহ্য করিয়া এক অন্ধকার কয়েদখানায় বন্দী অবস্থায় মারা যান।

সেকালের বাদুড়।

"সেকালের জন্তু"র কথা বলিলেই একটা কোন কিম্ভূতকিমাকার জানোয়ারের চেহারা মনে আসে। যে সকল জন্তু এখন দেখিতে পাই না, অথচ যাহার কঙ্কালচিহ্ন দেখিয়া বুঝিতে পারি যে সে এককালে পৃথিবীতে ছিল, তাহার চেহারা ও চালচলন সম্বন্ধে স্বভাবতই কেমন একটা কৌতূহল জাগে। তাহার উপর যদি তাহার মধ্যে কোন অদ্ভুত বিশেষত্বের পরিচয় পাই, তবে ত কথাই নাই।

সেকালের "বাদুড়" লিখিলাম বটে, কিন্তু তাহার চেহারা দেখিলে সব সময়ে বাদুড় বলিয়া চিনিবে কিনা সন্দেহ। কারণ, সে সময়ের এক একটা জন্তুকে আজকালকার কোন নামে পরিচিত করা অনেক সময়েই অসম্ভব। মনে কর একটা জন্তু, তার সাপের মত গলা; কচ্ছপের মত পিঠ কুমীরের মত দাঁত তিমির মত ডানা আর গিরগিটির মত মাথা—তখন তাহাকে কি নাম দিবে? সেইজন্য বাদুড় বলিতে খুব সাবধানে বলা দরকার —যেন আজকালকার নিরীহ চামচিকা গোছের কিছু একটা মনে করিয়া না বস।

আজকাল যে সকল বাদুড় দেখিতে পাও, তাহাদের চেহারা ও চালচলনের মধ্যে কত তফাৎ! কোনটার কাণ খরগোসের মত লম্বা, কোনটার কাণ ইঁদুরের মত গোলপানা; কোনটার মুখ শেয়ালের মত, কোনটার মুখ ভেংচিকাটা সঙের মত; কারও নাক পদ্ম ফুলের মত ছড়ান, কারও নাক নাই বলিলেও হয়। কিন্তু সেকালের যে জানোয়ার গুলাকে বাদুড় বলিতেছি তাহাদের মধ্যে আরও অদ্ভুত রকমারি দেখা যাইত। এক একটাকে দেখিয়া মনে হয় যেন বাদুড় পাখী আর কুমীরে মিলিয়া খিচুড়ি পাকাইয়াছে। এগুলিকে সাধরণ ভাবে বলা হয়—টেরোড্যাক্টাইল (Pterodactyl), অর্থাৎ যাহার আঙ্গুলে পাখা।

পাহাড়ের গায়ে যে সব পাথরের স্তর থাকে, তাহারা চিরকালই পাথর ছিল না। অনেক পাথর এক সময় মাটির মতন নরম ছিল। সেই নরম মাটিতে জানোয়ারের কঙ্কাল জমিয়া অনেক সময়ে একেবারে পাথর হইয়া থাকে—এই রকম পাথরকে এক কথায় জীবশিলা বলা যাইতে পারে। এক সময় ছিল, যখন পৃথিবীতে পাখী বা বাদুড় কিছুই দেখা যায় নাই—তখন সরীসৃপের যুগ ছিল। অদ্ভুত কুমীর বা গোসাপ তখন ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধরিয়া পৃথিবীতে দৌরাত্ম্য করিত। সেই অতি প্রাচীন যুগের পাথরে এসকল বাদুড়ের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না—যা কিছু পাওয়া যায় সবই আরও আধুনিক যুগের। "আধুনিক" বলাতে মনে করিওনা যে মাত্র কয়েক শত

বা সহস্র বৎসরের কথা বলিতেছি—সে "আধুনিক" যুগ কয় লক্ষ বৎসর আগেকার তা আমি জানি না। পাথরের মধ্যে কি রকম কঙ্কাল পাওয়া যায় তাহার একটু নমুনা দিলাম। এই বাদুড়টার লম্বা ল্যাজ ছিল, তাহার আগাটুকু বৈঠার মত চ্যাপ্টা।

যতরকম "বাদুড়" পাওয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে সব চাইতে পুরাতনটির চেহারা এবারের রঙিন ছবিতে দেওয়া হইয়াছে। ছবিতে দেখ ইনি সাপের মত লম্বাটে এক কুমীরের সঙ্গে লড়াই বাধাইয়াছেন—মৎলবটা এই যে কুমীরের মুখের গ্রাস কাড়িয়া খাইবেন। ইনি যে মাংসাশী ছিলেন, ইঁহার দাঁতের মধ্যেই তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ইঁহার নাম রাখা হইয়াছে "ডাইমর্ফোডন" (Dimorphodon) অর্থাৎ দ্বিমূর্ত্তিদন্তী।

সবগুলি বাদুড়ই যে প্রকাণ্ড বড় হইতে তাহা নহে, কিন্তু সব চাইতে বড় গুলি যে

খুবই বড় তাহাতে সন্দেহ নাই। দক্ষিণ আমেরিকায় যে সকল বাদুড়ের চিহ্ন পাওয়া

গিয়াছে তাহার একএকটি ডানা মিলিলে ২৫ ফুট চওড়া হয়। ইহাদের মাথার উপরে অদ্ভুত এক প্রকাণ্ড শিং ছিল। এই শিংটা তাহার কি কাজে লাগিত তাহা জানি না, কিন্তু ইহাতে তাহার বিদ্‌ঘুটে চেহারার কোন উন্নতি হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। এত বড় জন্তুটা উড়িলে পরে তাহার ডানা ঝাপটাইবার শব্দ নিশ্চয়ই বহুদূর হইতে শোনা যাইত। ইহারা কোনরূপ শব্দ করিত কি না বলিতে পারি না, কিন্তু আওয়াজ করিলে সেটা খুব সুমিষ্ট হইত কি না সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ইহাদের মুখে নাকি দাঁত থাকিত না কিন্তু তাহাতেও আশ্বস্ত হইবার বিশেষ কোন কারণ দেখি না, কারণ ইহার যে ঠোঁট ছিল তাহাতে সাংঘাতিক ধার! সুতরাং তাহার ঠোকর দুএকটা খাইলে আর বেশী খাইবার দরকার হইত না। মোট কথা, এ জন্তুটা যে সেকালেই লোপ পাইয়াছে এটা আমাদের পক্ষে সৌভাগ্যের কথা বলিতে হইবে। তা নহিলে কিরকম অবস্থা হইতে পারিত, তাহা আগের পৃষ্ঠার ছবি দেখিয়া সহজেই অনুমান করিতে পার।

পৌষ মাসের ধাঁধার উত্তর দাতাদের নাম—

অমরেন্দ্রনাথ দে, সুশীলকুমার সেন, হিমাংশুচরণ চৌধুরী, রাজীবলোচন সেনাঙ্গী, প্রকৃতি দেবী, ক্ষেমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধাপ্রসাদ প্রামাণিক, দেবজ্যোতী বর্ম্মণ, সুধীরচন্দ্র সেনগুপ্ত, সুধীরকুমার মল্লিক, রবীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, কাশীনাথ ভট্টাচার্য্য, রঙ্গপুর বণিক লাইব্রেরী, মায়া দেবী, লতিকা দেবী, ললিতকুমার মুখোপাধ্যায়, কল্যাণকুমার বসু, নির্ম্মলকুমার সেনগুপ্ত, ঈশ্বরচন্দ্র নাথ, জ্যোতিপ্রকাশ ঘোষ, সুজাতা রায়, গোবিন্দপ্রসাদ ঘোষ, কনকলতা ঘোষ, সুবোধকৃষ্ণ পাল, দাসক্ষেমেলি লাইব্রেরী, মুক্তকেশী দত্ত।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর—

১। আকবর ২। বামন

সিন্ধু ঈগলের ডাকাতি

(৩৬১ পৃষ্ঠা দেখ)

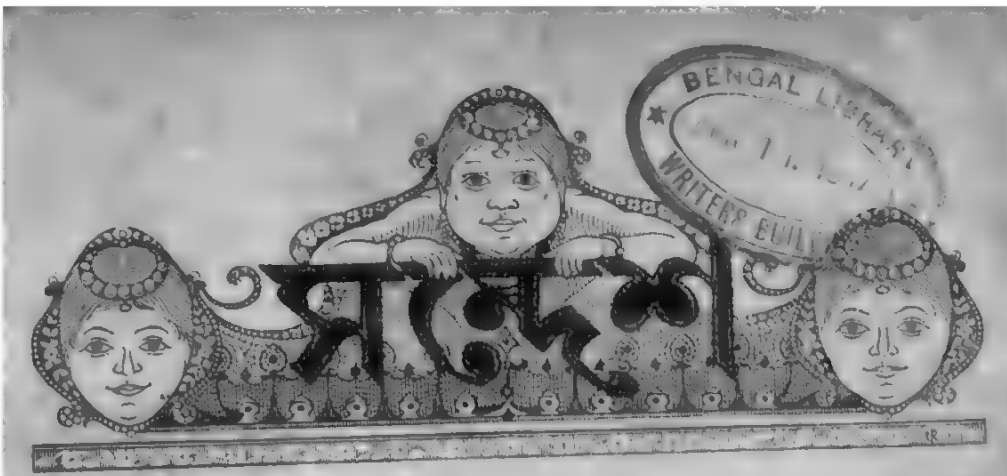

BENGAL LIBRARY
WRITERS' BUILDING

চতুর্থ বর্ষ | চৈত্র, ১৩২৩ | দ্বাদশ সংখ্যা

বর্ষ শেষ।

শুন রে আজব কথা, শুন বলি ভাই রে—
বছরের আয়ু দেখ আর বেশী নাই রে।
ফেলে দিয়ে পুরাতন জীর্ণ এ খোলসে
নূতন বরষ আসে, কোথা হ'তে বল সে!
কবে যে দিয়েছে চাবি জগতের যন্ত্রে,
সেই দমে আজও চলে না জানি কি মন্ত্রে!
পাকে পাকে দিনরাত ফিরে আসে বার বার,
ফিরে আসে মাস ঋতু—এ কেমন কারবার॥
কোথা আসে কোথা যায় নাহি কোন উদ্দেশ,
হেসে খেলে ভেসে যায় কত দূর দূর দেশ।
রবি যায় শশী যায় গ্রহ তারা সব যায়,
বিনা কাঁটা কম্পাসে বিনা কল কব্জায়।
ঘূরপাকে ঘুরে চলে, চলে কত ছন্দে
তালে তালে হেলে দুলে চলেরে আনন্দে॥

নিরেট গুরুর মৃত্যু।

গর্ত্তে পড়িয়া যাওয়ার গোলমালে গুরু ও তাঁহার চেলারা সকলেই বামনের ভবিষ্যৎ-বাণীর কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। ঘোড়ায় চড়িবার পর গুরুর হঠাৎ মনে হইল যে তাঁহার পা ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে, ভয়ে তাঁহার আত্মাপুরুষ শুকাইয়া উঠিল। তবে বাড়ী আসিয়া পৌঁছান অবধি তিনি আর কিছু বলিলেন না।

বুড়া মানুষ ঘোড়ার পিঠ হইতে পড়িয়া গায়ে ত খুবই ব্যথা হইয়াছিল, তার উপর পা ঠাণ্ডা হইয়া যাওয়ার ভয়। গুরুর আর সারা রাত ঘুম হইল না, বিছানায় পড়িয়া কেবল ছটফট্ করিতে লাগিলেন। গায়ের ব্যথা যে পড়িয়া গিয়া হইয়াছে, তাহা তাঁহার মাথায় ঢুকিল না, তিনি বুঝিলেন যে,পা যখন ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে তখন তাঁহার আর মরিবার দেরী নাই, তাই বোধ হয় এত কষ্ট। ভয়ে গোঁ গোঁ করিয়াই গুরুর রাত কাটিয়া গেল, ভোরবেলাই তিনি সব ক'জন চেলাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

তাহারা তৎক্ষণাৎ আসিয়া হাজির! গুরুর অবস্থা দেখিয়া তাহারা ত বেজায় ভড়কাইয়া গেল। তাঁহার চোখ কোটরে ঢুকিয়া গিয়াছে, মুখ শুক্‌নো, রংও ফ্যাকাশে হইয়া গিয়াছে, কথাও মুখ দিয়া ভাল করিয়া বাহির হইতেছে না। হটাৎ একটা মস্ত বড় দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "আর দেখ্‌ছ কি? এবার চিতার জোগাড় কর।" পাঁচ চেলা হাঁউমাঁউ করিয়া লাফাইয়া উঠিল "সে কি গুরু ঠাকুর?" গুরু বলিলেন "আর কি? 'চরণম্ শীতং জীবননাশম্' এরি মধ্যে ভুলে গেলে নাকি?" কাল যে গর্ত্তটার মধ্যে পড়ে গিয়েছিলাম, সেটা কাদায় জলে ভর্ত্তি, তাইতে কখন যে পা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল তা টেরও পাইনি। যখন টের পেলাম, তখন আমার বামনের কথা মনে পড়ে গেল। সেই থেকে সারারাত আমি ঘুমাইনি, আর যন্ত্রনাও কি কম ভোগ করেছি? এখন বেশ বুঝতে পারছি, যে আমার মরণকাল ঘনিয়ে এসেছে; তা আর ভেবে কি হবে? এইবার পোড়াবার যোগাড় দেখ।"

চেলারা ভয় পাইয়াছিল খুবই, কিন্তু গুরুকে ঠাণ্ডা করিবার জন্য তাহারা নানারকমে সান্ত্বনা দিতে লাগিল। কিছুতেই যখন গুরুর ভয় গেল না, তখন তাহারা ঠিক করিল যে, গুরুকে ভূতে পাইয়া থাকিবে। চট্ করিয়া তাহারা গাঁয়ের ওঝাকে ডাকিয়া আনিল। ওঝা মহারাজ ভূত ঝাড়িতে খুবই ওস্তাদ। সে আসিয়া প্রথমে মন দিয়া সব কথা শুনিল; তারপর দাঁত মুখ খিঁচাইয়া গুরুর খাটের কাছে ছুটিয়া গিয়া বলিল, "বলি, ও

মশায়, হল কি আপনার ? কোনো খানে ব্যাথা ট্যাথা হয়েছে নাকি ?" গুরু আর কোন উত্তর না দিয়া কেবলি চোখ বুজিয়া বলিতে লাগিলেন "চরণং শীতং জীবননাশম্"। ওঝা চীৎকার করিয়া বলিল, "ও ! সেই বামন বেটা বুঝি বলেছে আপনাকে যে পা ঠাণ্ডা হয়ে গেলেই আপনি মারা যাবেন ? কৈ সে, তাকে একবার দেখিয়ে দিন ত ? আমি তার পা গরম করেই তার দফা সারব, তার মাথায় ঢেঁকি পুজো করে দেব, তা হলেই সব আপদ চুকে যাবে। একবার তাকে দেখিয়েই দিন না।"

গুরু তখন চোখ খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঢেঁকি পূজো বলে কিছু আছে নাকি ? কৈ কখনও ত তার কথা শুনিনি ! কি বলত ?" ওঝা তখন বলিতে আরম্ভ করিল, "এ পূজোটা এখানে হয়না বটে ; তা আমি সব বলছি শুনুন,—এক দেশে এক দোকানদার ছিল, সে রোজ একজন করে অতিথিকে খাওয়াত। যেখানেই সে কোন লোককে দেখতে পেত, তাকে তখুনি বাড়ী এনে হাজির করত। তার ছেলেপিলে ছিল না, বাড়ীতে খালি এক স্ত্রী। সে ত তার স্বামীর জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠ্‌ল, যখন তখন লোক এনে হাজির করছে, আর তাদের রেঁধে খাওয়াতে হচ্ছে। স্বামীকে কিছু বলেও লাভ নেই, সে মোটেই তা শুনবে না, কাজেই গিন্নি শেষে এক মতলব ঠাওরাল। সকালে বাজারে যেতেই সেদিন মুদীর সঙ্গে এক ব্যক্তির দেখা হল। তাকে দেখে মুদী মহা খুসী হয়ে বল্ল, "মশায় যদি দয়া করে আমার বাড়ী আজ পায়ের ধূলো দ্যান," সে লোকটাও তখুনি রাজী হয়ে গেল। মুদী তখন তাকে বল্‌ল, "আমার একটু দেরী আছে, আপনি ততক্ষণ এগিয়ে যান্, আমার গিন্নিকে গিয়ে বল্‌বেন যে আমি আপনাকে পাঠিয়েছি ; তা হলেই হবে"। সে লোক ত গিয়ে মুদীগিন্নিকে হাঁকডাক করে খবর দিল, গিন্নিও "তা বেশ বাছা, এস বোসো" বলে তাকে মাদুর বিছিয়ে বসাল। সে বসতেই গিন্নি উঠান ঝাঁট পাট দিয়ে গোবরজল ছড়া দিয়ে পরিষ্কার কর্‌ল, নিজেও হাত পা ধুয়ে শুদ্ধ হয়ে এল। তারপর ঢেঁকিশালে গিয়ে ঢেঁকিটাকে আচ্ছা করে ছাই দিয়ে ঘষতে সুরু করল, খানিক পরে সেটার সামনে শুয়ে পড়ে খুব ঢিপ্ ঢিপ্ করে প্রণাম করতে লাগল ; মন্ত্রও পড়তে লাগল কি সব বিড় বিড় করে। তারপর ছাইগুলো ঝেড়ে ফেলে উঠে পড়ল। অতিথিটি এতক্ষণ হাঁ করে তার রকম সকম সকল দেখছিল, তাকে উঠতে দেখে সে বল্‌ল "বলি ও গিন্নিমা, এটা কি পূজো গা ? এরকম ত কখনও দেখিনি।" মুদী গিন্নি বল্‌ল, "ও আমাদের জাতের একটা নূতন পূজো বাছা, খানিক পরেই বুঝতে পারবে," এই বলে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে যেন আপন মনেই বল্‌ল "তোমার মাথায়ই ত পূজো শেষ

করা হবে"। তার মতলবই ছিল যে, লোকটা শুন্‌তে পায়, আর সে তা পেলও। মুদী গিন্নি ঘরে ঢুকতেই "খুব বেঁচে গিয়েছি বাবা" বলে সে ভোঁ করে ছুট্ দিল। সেও পালিয়েছে, আর মুদীও বাড়ী এসে হাজির। সে এসেই হেঁকে বল্‌ল "হ্যাঁ গা গিন্নি, যে লোকটিকে পাঠিয়েছিলাম, সে গেল কোথায়?" গিন্নি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে বল্‌ল "আহা যা না ছিরির লোক পাঠিয়েছিলে! এসেই আমাকে বলে কিনা, ঢেঁকিটা আমাকে দাও"। আমি তাকে কত বুঝিয়ে বল্লুম যে মুদী এখুনি বাড়ী আস্‌বে, যা চাইবার তার কাছেই চেও, আমি আর কি করে দেব; মাদুর পেতে বস্‌তেও দিলুম। ওমা সে দেখি রেগে গস্‌গসিয়ে বেরিয়ে গেল।" মুদী বল্‌ল "যত সব তোর বজ্জাতি, ঢেঁকি চাইছিল, তাই দিলিনে কেন তাকে? দেখ্ ত এখন ঘর থেকে না খেয়ে মানুষ চলে গেল। যাই এখন তাকে খুঁজে মরি।" সে ত বেরুল। এদিকে সেই লোকটা করেছে কি, মুদী এলে কি হয় তাই দেখবার জন্যে বাড়ীর কাছের একটা গলিতে লুকিয়ে আছে। মুদীকে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে ছুটে বেরুতে দেখে সে ভাবল "এই রে! নিশ্চয় আমাকে পাক্‌ড়াতে আসছে"; সে ত অমনি দে ছুট্! মুদী তাকে ছুট্‌তে দেখে চেঁচিয়ে বল্‌তে লাগ্‌ল, "ওহে থামনা, ঢেঁকি নিয়ে যাও. ঢেঁকি নিয়ে যাও," কিন্তু তাতে লাভ হল এই যে লোকটা ভড়্‌কে গিয়ে আরও জোরে দৌড়ল। মুদী বেচারা মোটা মানুষ, মস্ত ভুঁড়ী তার, সে ছুট্‌তে না পেরে বাড়ী ফিরে এল। এই হচ্ছে ঢেঁকি পূজো। সে লোকটাও যেমন শুধু শুধু ভয় পেয়েছিল, আপনিও দেখি তাই। এখন আপনার মরবার কোনই সম্ভাবনা নেই।"

গুরু তার গল্প শুনে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লেন, "তুমি বেশ লোক বাপু, সাধে লোকে তোমায় মস্ত ঠাট্টাবাজ বলে।" গুরুকে হাস্‌তে দেখে চেলাদের যেন ধড়ে প্রাণ এল, তখন ওঝাও হাত নেড়ে বক্তৃতা করতে লাগল "হাঁ হাঁ, বামন যা বলেছিল তা খাঁটি কথা বটে, তবে কিনা তার মানেটাও ঠিকমত বোঝা চাই। পা যদি ঠাণ্ডা হয় তা হলে মরবে বটে, কিন্তু এটাত দেখতে হবে যে পা খানা শুধু শুধুই ঠাণ্ডা হল না জল টল কিছু লেগে। আপনি জলে পড়ে গেলে যে পা ঠাণ্ডা হবে সে ত জানা কথা, না যদি হত তাহলেই বরং অবাক হবার কথা। আপনি এখন নিশ্চিন্ত হোন্, কোনো ভয়ের কারণ নেই। এর পর যদি কোন দিন বাইরের কোনো কারণ না থাকা সত্ত্বেও "চরণং শীতম্" হয়, তাহলে অবশ্য তখন "জীবননাশম্"এর ভয় হবে। এখন কেন শুধু শুধু ভয় পাচ্ছেন?" ওঝার কথাটা গুরু ঠাকুরের বেশ মনে লাগিল, তাঁর ভয়টাও

খানিকটা কমিয়া গেল। তিনি তখন খাওয়া দাওয়া করিয়া উঠিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

কদিন এই ভাবে কাটিলে পর, একদিন রাত্রে ভয়ানক বৃষ্টি আরম্ভ হইল। গুরুমশায় ঘুমাইতে ছিলেন, কাজেই তিনি তাহা বুঝিতে পারিলেন না। এমন কি যখন খড়ের চাল ফুটা হইয়া তাঁহার পায়ের কাছে বিছানাতে জল পড়িতে লাগিল, তখনও তাঁহার হুঁস নাই। খানিক পরে বৃষ্টি থামিয়া গেল, গুরু কিন্তু সেই ভিজা জায়গায় পা দিয়া ঘুমাইয়াই রহিলেন। ঠাণ্ডায় যখন তাঁহার পা প্রায় অসাড় হইয়া আসিয়াছে, তখন হটাৎ তিনি ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলেন। পা ঠাণ্ডা দেখিয়া তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল। তাহা হইলে ত তাঁহার মরিবার সময় উপস্থিত; কারণ এখন ত বিনা কারণেই পা ঠাণ্ডা হইয়াছে। তিনি খুব জোরে চেঁচাইয়া চেলাদের ডাকিতে লাগিলেন। তাহারা ঘুম ছাড়িয়া হুড়দাড় করিয়া ছুটিয়া আসিল। গুরুর যে মরণ কাল উপস্থিত সে বিষয়ে এবার আর চেলাদেরও সন্দেহ হইল না। এবার ত আর গুরু জলে পড়েন নাই? পা ত আপনা আপনিই ঠাণ্ডা হইয়াছে। আর বিছানাটা যে ঠাণ্ডা সে বোধহয় গুরুর পা লাগিয়াই হইয়াছে। তাহাদের গোলমালে গাঁয়ের লোক আসিয়া জুটিল, তাহাদের বুদ্ধিও ঐ চেলাদেরই কাছাকাছি, একই জাতের লোক ত? তাহারা ঠিক বুঝিল যে গুরুর আর মরিবার দেরি নাই। তাহারা সকলে গুরুর বিছানা ঘিরিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, আর নিরেট গুরু চোখ বুজিয়া মাঝে মাঝে বলিতে লাগিলেন, "চরণং শীতং জীবননাশম্"

ক দিন এই ভাবে কাটিল। না খাইয়া না ঘুমাইয়া গুরু এত কাহিল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তিনি শেষে একদিন মূর্চ্ছা গেলেন। আর কোথা যায়! তাঁহার চেলার দল ষাঁড়ের মত চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, মাথা চাপ্‌ড়াইতে চাপ্‌ড়াইতে বলিতে লাগিল "ওগো আমাদের গুরু ঠাকুর আর নেই গো।"

খানিকক্ষণ কাঁদিয়া একজন বলিল, "আর কেঁদে কি হবে? যা হবার তা ত হয়ে গেল, এখন এঁর সৎকারের চেষ্টা দেখতে হবে। আগে স্নান করিয়ে নেওয়া যাক্।

মঠে একটা মস্ত চৌবাচ্ছা ছিল, তাহার কানায় কানায় ভর্ত্তি জল। দুই চেলাতে ধরাধরি করিয়া গুরুকে সেই জলে ঝুপ্ করিয়া ফেলিয়া দিল। তারপর সকলে মিলিয়া খুব করিয়া ঘষিয়া তাঁহাকে স্নান করাইতে লাগিল। জল লাগিবামাত্র গুরুর জ্ঞান হইল, কিন্তু জলের ভিতর থাকাতে তিনি কোনো কথাই বলিতে পারিলেন না; হাত পাও চেলারা

ধরিয়া রাখিয়াছিল, কাজেই হাত নাড়িবারও জো ছিল না। এইরূপে খানিকক্ষণ থাকিয়া, মূর্খ চেলাদের বুদ্ধির দোষে গুরু নিশ্বাস আটকাইয়া মরিয়া গেলেন।

তখন চেলারা একখানা খাট আনিয়া তাঁহাকে বসাইল, সে দেশের ঐরূপ রীতি। তাহার পর তাঁহাকে ভাল করিয়া ফুল দিয়া সাজাইয়া কাঁধে করিয়া শ্মশানে লইয়া চলিল। যত গাঁয়ের লোক আসিয়া তাহাদের দলে যোগ দিল। চেলারা গান করিতে করিতে চলিল "চরণং শীতং জীবননাশম্"। শ্মশানে পৌঁছিয়া খুব ধূমধাম করিয়া গুরুকে পোড়াইয়া তাহারা বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

শ্রীসীতা দেবী।

দানের পুণ্য।

"গরীব বুড়ীকে দয়া কর বাবা! সারাদিন খেতে পাইনি, একটি পয়সা দাও—ভগবান তোমার মঙ্গল করবেন।" পথের ধারে একটি বুড়ি এই বলে ভিক্ষা করছিল। একে শীতের দিন তার উপর কন্‌কনে ঠাণ্ডা বাতাস, মাঝে মাঝে বরফও পড়ছে। ছেঁড়া, কুটি কুটি ময়লা কাপড় বুড়ির গায়ে, তা দিয়ে কি আর শীত নিবারণ হয়? সে বসে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছিল। তবু সে নিরাশ হয়নি, যে যায় বুড়ী তারই মুখের দিকে তাকায় আর বলে "গরীব বুড়িকে দয়া কর বাবা।"

ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে এল, বুড়ি তখনও ভিক্ষার আশায় বসে রয়েছে; এমন সময় একজন পথিক এসে উপস্থিত। বুড়িকে দেখেই তিনি ভারী দুঃখ করে বল্‌লেন—"আহা! এমন দিনেও কি কেউ বাইরে থাকে? না জানি তোমার কত কষ্ট হচ্ছে!" এই বলে তাকে কিছু না দিয়েই তিনি চল্‌লেন। খানিকদূর গিয়েই তাঁর মনটা জানি কেমন করে উঠ্‌ল, তিনি ভাব্‌লেন—নাঃ, বুড়িকে কিছু দিলে হত! কিন্তু তাঁর হাতে যে মোটা দস্তানা রয়েছে, তা কি এত ঠাণ্ডায় খুলতে ইচ্ছা করে? আর তা না খুল্‌লে পকেট থেকে কি করে পয়সা বার করেন? এই ভেবে ভদ্রলোকটি আর ফিরে তাকালেন না।

কিছু না পেয়ে বুড়ির কষ্ট হলো বই কি! তবু, ভদ্রলোকটির দুটি কথা শুনেই সে সুখী হলো। একটু পরেই জুড়ি হাঁকিয়ে এক মস্ত বড়লোক এসে উপস্থিত। বুড়িকে দেখে তার মনে দুঃখ হলো। ঠাণ্ডার জন্য গাড়ীর দরজার কাচ টানা ছিল, তিনি তখন কাচ নামিয়ে কোচমানকে বলে গাড়ী থামালেন। বুড়ি কিছু পাবার আশায় মহাব্যস্ত হয়ে গাড়ীর দরজার কাছে এসে উপস্থিত। ভদ্রলোক পকেট থেকে একটি টাকা নিয়ে বুড়িকে দিতে গেলেন। হাত বাড়িয়ে দেবার সময় দেখ্‌লেন সেটা টাকা নয়—ভুলে তিনি মোহর তুলেছেন। তিনি মোহরের বদলে টাকা দিতে যাবেন এমন সময় টুক করে হাত থেকে মোহরটি পড়ে গেল। সেই সঙ্গে এমনি জোরে একটা কন্‌কনে ঝাপটা এলো যে, ভদ্রলোকটি তাড়াতাড়ি কাচ টেনে দিয়ে গায়ে গরম কাপড় জড়ালেন—তবু তাঁর কাঁপুনি ধরে গেল।

তারপর গাড়ীতে যেতে যেতে কেবলি সেই মোহরের কথা তাঁর মনে আসে, আর এই বলে মনকে প্রবোধ দেন—"আমার ঢের আছে, তা একটা মোহর দিলামই বা—তাতে বরং পুণ্য হবে।"

বাড়ী গিয়ে ধনী লোকটি খাওয়া দাওয়া শেষ করে আগুণের সাম্‌নে বসে আরাম কর্‌ছিলেন, তখন আবার সেই বুড়ির কথা ভেবে মনে মনে বল্‌তে লাগলেন—"বুড়িকে বড্ড বেশী দিয়ে ফেলেছি। যাহোক এখন আর দুঃখ করে কি হবে? টাকাটা বুড়ীর কাজে লাগবে। আমি যে ভারী মহৎ একটা কাজ করে ফেলেছি তাতে আর সন্দেহ কি? দুঃখের বিষয় কেউ সেটা দেখ্‌তে পেলেনা—যাহোক ঈশ্বর আমাকে অবশ্য তার পুরস্কার দিবেন।"

এদিকে আগের সেই পথিকটিও বাড়ী গিয়ে খেতে বসেছেন। চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় কতরকমের খাদ্য তাঁর সাম্‌নে কিন্তু সে দিকে তাঁর মন নেই। সেই বুড়ীর চেহারা কেবলই তাঁর চোখের সাম্‌নে ভাস্‌ছে। তার সেই ছেঁড়া কাঁথা, জড়সড় ভাব, আর ছল্‌ছল্ চোখ কেবলই তাঁর মনে পড়ছে। আর তাঁর সহ্য হলো না। "আরো একজনের খাবার জায়গা কর, আমি একজনকে নিয়ে আস্‌ছি" চাকরকে এই কথা বলেই তিনি বেরিয়ে পড়লেন।

বাইরে তখন ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার—ঠাণ্ডার ত কথাই নাই। তবু তিনি চলেছেন সেই বুড়ীর উদ্দেশে। বুড়ী তখন রাস্তায় উপুড় হয়ে ধনী ভদ্রলোকের দেওয়া টাকাটি খুঁজছে, এমন সময় তিনি গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—"কি খুঁজছ বুড়ী? যে অন্ধকার, চোখে কি কিছু দেখা যায়!" কাঁপতে কাঁপতে বুড়ী তাঁকে সেই টাকার কথা বল্‌লে পর তিনি বল্‌লেন—"খুঁজে আর কি হবে, তুমি চল আমার সঙ্গে—খাওয়া দাওয়া করে আমার বাড়ীতেই আজ শুয়ে থাকবে এখন। আমি তোমাকে আগুন জ্বেলে দিব, গরম কাপড় দিব।"

বুড়ী অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইল, যেন তাঁর কথাই বিশ্বাস হচ্ছে না। তারপর তাঁকে শত শত আশীর্ব্বাদ করতে করতে তাঁর সঙ্গে চল্‌ল। বুড়ী ভাল করে চলতে পারে না—তাই সে লোকটি তাকে হাতে ধরে সাবধানে বাড়ী নিয়ে এলেন। সেখানে ভাল খাবার খেয়ে, ভাল কাপড় পরে, আরামে শুয়ে বুড়ী যে ঘুম ঘুমাল তেমন ঘুম সে তার জীবনে কখনও ঘুমায় নি।

সেদিন, স্বর্গের যে খাতায় পুণ্যের হিসাব লেখা হয়, তাতে সেই ভদ্রলোকের অনুতাপের কথা বড় বড় অক্ষরে লেখা ছিল—কিন্তু ঐ ধনী লোকটির মোহরের কোন হিসাব ছিল না।

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়।

সিন্ধু ঈগল।

সমুদ্রের ধারে, যেখানে ঢেউয়ের ভিতর থেকে পাহাড়গুলো দেয়ালের মত খাড়া হ'য়ে বেরোয়, আর সারাবছর তার সঙ্গে লড়াই ক'রে সমুদ্রের জল ফেনিয়ে ওঠে, তারই উপরে অনেক উঁচুতে পাহাড়ের চূড়ায় সিন্ধু ঈগলের বাসা। সেখানে আর কোন পাখী যেতে সাহস পায় না—তারা সবাই নীচে পাহাড়ের গায়ে ফাটলে ফোকরে বসবাস করে। পাহাড়ের উপরে কেবল সিন্ধু-ঈগল—তারা স্বামী স্ত্রীতে বাসা বেঁধে থাকে।

ঈগলবংশ রাজবংশ—পাখীর মধ্যে সেরা। সিন্ধু-ঈগলের চেহারাটি তার বংশেরই উপযুক্ত—মেজাজটি ও রাজারই মত। সিংহকে আমরা পশুরাজ বলি—সুতরাং ঈগলকেও পক্ষীরাজ বলা উচিত; কিন্তু তা আর বলবার যো নেই, কারণ রূপকথার আজগুবি গল্পে লেখে, পক্ষীরাজ নাকি এক রকম ঘোড়া! যা হো'ক—শুনতে পাই রাজারা নাকি মৃগয়া করতে ভাল বাসেন। তা'হলে সে হিসাবেও সিন্ধু-ঈগলের রাজবংশী চালের কোন অভাব নাই। চিল কাক সাঁচান শকুন সবাই মরা মাংস খায়—কাজেই সে রকম খাওয়া যতক্ষণ জোটে ততক্ষণ তাদের আর শিকার করা দরকার হয় না। কিন্তু সিন্ধু ঈগলের স্বভাবটি ঠিক তার উল্টা—যতক্ষণ শিকার জোটে ততক্ষণ সে মরা জানোয়ার পেলেও তা ছোঁয় না। কিন্তু

একটি তার বদভ্যাস আছে, সেটাকে ঠিক রাজার মত বলা যায় না ; সেটি হ'চ্ছে অন্যের শিকার কেড়ে খাওয়া !

সমুদ্রের ধারে ছোট বড় কত রকম পাখী—তারা সবাই মাছ ধ'রে খায়। নিতান্ত ছোট যারা, তারা ধরে ছোট ছোট মাছ—সে সব মাছের উপর সিন্ধু ঈগলের কোন লোভ নাই। কিন্তু বড় বড় গাংচিল আর মেছো চিল গুলো যে সব বড় বড় মাছ জল থেকে টেনে তোলে, তার দুচারটা যে মাঝে মাঝে সিন্ধু ঈগলের পেটে যায় না, এমন নয়। সমুদ্রের ধারে শিকারের অভাব কি ? মাছ খেয়ে যদি অরুচি ধরে, তবে এক আধটা পাখী মেরে নিলেই হয় ! তাছাড়া একটু ডাঙার দিকে গেলে ইঁদুর খরগোস এমন কি ছাগলছানাটা পর্য্যন্ত মিলতে পারে। কিন্তু তবু সে অন্যের শিকারে জবর দখল জাহির করতে ছাড়ে না। এই যে ডাকাতি ক'রে কেড়ে খাওয়া, এ বিদ্যায় সিন্ধু ঈগলের বেশ একটু কেরামতি আছে। তারা স্বামী স্ত্রী দুজনে মিলে ডাকাতি করে। সারাদিন তারা আকাশে উড়ে উড়ে বেড়ায়। উড়তে উড়তে কোথায় গিয়ে ওঠে, মনে হয় যেন সে মেঘের রাজ্যে চলে গিয়েছে, পৃথিবীর উপর বুঝি তার কোন দৃষ্টি নেই। কিন্তু ঈগলের চোখ বড় ভয়ানক চোখ। ঐ উঁচুতে থেকেই সে সমস্ত দেখছে—কিছুই তার চোখ এড়াবার যো নাই। ঐ যে কত পাখী জলের ধারে খেলছে আর মাছ ধরছে, তার মধ্যে একটা মেছো-চিল ঘুরে ঘুরে শিকার খুঁজছে—ঈগল পাখীর চোখ রয়েছে তারই উপর।

জলের নীচে একটা মাছ বারবার উঠ্‌ছে আর নাম্‌ছে, চিল কেবল তাই দেখ্‌ছে—মাথার উপরে যে ঈগলরাজ টহল ফিরছেন সে দিকে তার খেয়ালই নাই। একবার মাছটা যেই ভেসে উঠেছে, আর অমনি ছোঁ করে মেছো চিল জলের উপরে পড়েছে। তারপর মাছ শুদ্ধ টেনে তুল্‌তে কতক্ষণ লাগে ! চিল ভাব্‌ছে এখন একটু নিরিবিলি জায়গা দেখে ভোজনে বস্‌বে, এমন সময়, চীঁ হিঁ হিঁ হিঁ হীঁ—ভূতের হাসির মত বিকট চীৎকার ক'রে কি একটা প্রকাণ্ড ছায়া তার ঘাড়ের উপর ঝড়ের মত তেড়ে নাম্‌ল ! সে আর কিছু নয়, সিন্ধু ঈগল ; ঐ মাছটার উপর তার নিতান্তই লোভ পড়েছে। তাড়া খেয়ে চিলের বাছা পালাতে পার্‌লে বাঁচে, কিন্তু পালাবে কোথায় ? দুদিক থেকে দুইটা ঈগল ক্রমাগত তেড়ে তেড়ে ছোবল মার্‌ছে ; তার একটি ছোবল গায়ে লাগ্‌লে হাড়ে মাংসে আল্‌গা হ'য়ে যায়। তার উপর সেই বিকট আওয়াজ যখন কানের কাছ দিয়ে হেঁকে যায়, তখন বুদ্ধি শুদ্ধি আপনা হতেই ঘুলিয়ে আসে। কাজেই মেছো চিলের মাছ খাওয়া

এবারে আর হ'ল না। সে বার কয়েক ঈগলের ঝাপ্‌টা এড়িয়ে তারপর প্রাণের ভয়ে মাছটাছ ফেলে পালাল।

সিন্ধু ঈগল অনেক সময় সমুদ্র ছেড়ে বড় বড় নদীর ধারে গাছের উপর বাসা বাঁধে। সে বাসাও একটা দেখবার মত জিনিষ। এক একটা বাসা ৫।৭ হাত চওড়া; বছরের পর বছর সেটাকে তারা ক্রমাগতই উঁচু করে একটা রীতিমত সিংহাসন বানিয়ে তোলে। এই বাসা-বানান ব্যাপারটা নাকি দেখতে ভারি মজার। একটা ঈগল অনেক কষ্ট ক'রে কতগুলো ডাল সংগ্রহ ক'রে আন্‌ল—আর একটা হয়ত সেগুলো পচ্ছন্দই করলনা। এম্নি ক'রে যত ডালপালা জোগাড় হয় তার অধিকাংশই খামখা নেড়ে চেড়ে ফেলে দেওয়া হয়। তখন তা নিয়ে তাদের মধ্যে ভারি একটা ঝগড়া লেগে যায়; তারা বাসা বানান বন্ধ রেখে মুখ ভার ক'রে বসে থাকে। আবার হটাৎ খানিক বাদেই তারা আপোষে ভাব ক'রে বাসা বানাতে লেগে যাবে।

এরা সাধারণত মানুষকে কিছু বলে না—বরং তাড়া করলে বাসাটাসা ফেলে পালায়। তবে, বাসায় যদি ছানা থাকে, তা হলে তাড়াতে গেলে অনেক সময়ে উল্টে তেড়ে আসে। তখন দেখা যায় তাদের তেজ কেমন সাংঘাতিক। একবার এক সাহেবের চাকর তামাসা দেখবার জন্য গাছে উঠে ঈগলের বাসায় উঁকি মারতে গিয়েছিল। তাতে ঈগলেরা তাকে তেড়ে এসে এমনি সাজা দিয়ে ছিল, যে সাহেব বন্দুক নিয়ে ছুটে না আসলে সে দিন তার তামাসা দেখবার সখ একেবারে জন্মের মত ঘুচে যেত।

খৃষ্টবাহন।

(রোমান ক্যাথলিক কাহিনী)

তার নাম অফেরো। অমন পাহাড়ের মত শরীর, অমন সিংহের মত বল, অমন আগুনের মত তেজ, সে ছাড়া আর কা'রও ছিল না। বুকে তার যেমন সাহস, মুখে তার তেমনি মিষ্টি কথা। কিন্তু যখন তার বয়স অল্প, তখনই সে তার সঙ্গীদের ছেড়ে গেল; যাবার সময় বলে গেল "যদি রাজার মত রাজা পাই, তবে তার গোলাম হয়ে থাকব। আমার মনের মধ্যে কে যেন বলে দিচ্ছে, তুমি আর কারও চাকরী ক'রো না; যে রাজা সবার বড়, সংসারে যার ভয় নাই, তারই তুমি খোঁজ কর।" এই বলে অফেরো কোথায় যেন বেরিয়ে গেল।

পৃথিবীতে কত রাজা, তাদের কত জনের কত ভয়। প্রজার ভয়, শত্রুর ভয়, যুদ্ধের ভয়, বিদ্রোহের ভয়—ভয়ে কেউ আর নিশ্চিন্ত নেই। এরকম হাজার দেশ ছেড়ে ছেড়ে অফেরো এক রাজ্যে এল, সেখানে রাজার ভয়ে সবাই খাড়া! চোরে চুরি করতে সাহস পায় না, কেউ অন্যায় করলে ভয়ে কাঁপে। অস্ত্রে শস্ত্রে সৈন্যসামন্তে রাজার প্রতাপ দশদিক দাপিয়ে আছে। সবাই বলে "রাজার মত রাজা।" তাই শুনে অফেরো তাঁর চাকর হ'য়ে রইল।

তারপর কতদিন গেল—এখন অফেরো না হ'লে রাজার আর চলে না—উঠতে বসতে তার ডাক পড়ে। রাজা যখন সভায় বসেন অফেরো তাঁর পাশে খাড়া। রাজার মুখের প্রত্যেকটি কথা সে আগ্রহ ক'রে শোনে! রাজার চলনচালন ধরনধারন ভাবভঙ্গী সব তার আশ্চর্য্য লাগে। আর রাজা যখন শাসন করেন, চড়া গলায় হুকুম দেন, অফেরো তখন অবাক হ'য়ে ভাবে, "যদি রাজার মত রাজা কেউ থাকে, তবে সে এই!"

তারপর একদিন রাজার সভায় কথায় কথায় কে যেন সয়তানের নাম ক'রেছে। শুনে রাজা গম্ভীর হ'য়ে গেলেন। অফেরো চেয়ে দেখলে রাজার চোখে হাসি নেই, মুখখানি তাঁর ভাবনা ভরা। অফেরো তখন জোড়হাতে দাঁড়িয়ে বল্ল, "মহারাজের ভাবনা কিসের? কি আছে তাঁর ভয়ের কথা?" রাজা হেসে বল্লেন, "এক আছে সয়তান আর আছে মৃত্যু—এ ছাড়া আর কাকে ডরাই?" অফেরো বল্লেন, "হায় হায়, আমি এ কার চাকরী করতে এলাম? এ যে সয়তানের কাছে খাটো হ'য়ে গেল। তবে যাই সয়তানের রাজ্যে; দেখি সে কেমন রাজা!" এই ব'লে সে সয়তানের খোঁজে বেরুল।

পথে কত লোক আসে যায়—সয়তানের খবর জিজ্ঞাসা করলে তারা বুকে হাত দেয় আর দেবতার নাম করে, আর সবাই বলে, "তার কথা ভাই ব'লো না, সেযে কোথায় আছে কোথায় নেই—কেউ কি তা বলতে পারে?" এম্নি ক'রে খুঁজে খুঁজে কতগুলো নিষ্কর্ম্মা কুঁড়ের দলে সয়তানকে পাওয়া গেল। অফেরোকে পেয়ে সয়তানের ফূর্ত্তি দেখে কে! এমন চেলা সে আর কখনও পায়নি।

সয়তান বল্ল, "এস, এস, আমি তোমায় তামাসা দেখাই। দেখবে আমার শক্তি কত?" সয়তান তাকে ধনীর প্রাসাদে নিয়ে গেল, সেখানে টাকার নেশায় মত্ত হ'য়ে, লোকে সয়তানের কথায় ওঠে বসে; গরীবের ভাঙা কুঁড়ের ভিতরে গেল, সেখানে এক-মুটো খাবার লোভে পেটের দায়ে বেচারীরা পশুর মত সয়তানের দাসত্ব করে। লোকেরা

সব চলছে ফিরছে, কে যে কখন ধরা পড়ছে, কেউ হয়ত জানতে পারে না ; সবাই মিলে মারছে কাট্‌ছে আর কোলাহল করছে "সয়তানেরই জয়"।

সব দেখে শুনে অফেরোর মনটা যেন দমে গেল। সে ভাব্‌ল "রাজার সেরা রাজা বটে, কিন্তু আমার ত কৈ এর কাজেতে মন লাগছে না!" সয়তান তখন মুচকি মুচকি হেসে বল্লে, "চলত ভাই, একবারটি এই সহর ছেড়ে পাহাড়ে যাই। সেখানে এক ফকির আছেন, তিনি নাকি বেজায় সাধু! আমার তেজের সামনে তার সাধুতার দৌড় কতখানি তা' একবার দেখতে চাই"।

পাহাড়ের নীচে রাস্তার চৌমাথায় যখন তারা এসেছে, সয়তান তখন হঠাৎ কেমন ব্যস্ত হ'য়ে থমকিয়ে গেল—তারপর বাঁকা রাস্তা ঘুরে তড়্‌বড়্‌ ক'রে চল্‌তে লাগ্‌ল। অফেরো বল্লে, "আরে মশাই, ব্যস্ত হ'ন কেন? সয়তান বল্লে, "দেখছ না ওটা কি"! অফেরো দেখ্‌ল—একটা ক্রুশের মত কাঠের গায়ে মানুষের মূর্ত্তি আঁকা! মাথায় তার কাঁটার মুকুট—শরীরে তার রক্ত ধারা! সে কিছু বুঝতে পারল না। সয়তান আবার বল্লে, "দেখছ না ঐ মানুষটাকে—ও যে আমায় মানে না, মরতে ডরায় না,—বাবা রে! ওর কাছে কি ঘেঁষতে আছে? ওকে দেখলেই তফাৎ হটি"। বলতে বলতে সয়তানের মুখখানা চামড়ার মত শুকিয়ে এল।

তখন অফেরো হাঁফ ছেড়ে বল্লে, "বাঁচালে ভাই! তোমার চাকরী আর আমায় করতে হ'লোনা। তোমায় মানে না, মরতেও ডরায় না, সেই জনকে যদি পাই তবে তারই গোলাম হয়ে থাকি"। এই বলে আবার সে খোঁজে বেরুল।

তারপর যার সঙ্গে দেখা হয়, তাকেই সে জিজ্ঞাসা করে, "সেই ক্রুশের মানুষকে কোথায় পাব"?—সবাই বলে, "খুঁজতে থাক, একদিন তবে পাবেই পাবে"। তারপর এক দিন চল্‌তে চল্‌তে সে এক যাত্রীদলের দেখা পেল। গায়ে তাদের পথের ধূলা, হাঁটতে হাঁটতে সবাই শ্রান্ত, কিন্তু তবু তাদের দুঃখ নাই—হাসতে হাসতে গান গেয়ে সবাই মিলে পথ চল্‌ছে। তাদের দেখে অফেরোর বড় ভাল লাগল—সে বল্লে, "তোমরা কে ভাই? কোথায় যাচ্ছ?" তারা বল্লে, "ক্রুশের মানুষ যীশুখৃষ্ট—আমরা সবাই তাঁরই দাস। যে পথে তিনি গেছেন, সেই পথের খোঁজ নিয়েছি"। শুনে অফেরো তাদের সঙ্গ নিল।

সে পথ গেছে অনেক দূর। কত রাত গেল দিন গেল, পথ তবু ফুরায় না—চল্‌তে চল্‌তে সবাই ভাবছে, বুঝি পথের শেষ নাই! এমন সময় সন্ধ্যার ঝাপসা আলোয় পথের

শেষ দেখা দিল। ওপারে স্বর্গ, এবারে পথ, মাঝে অন্ধকার নদী। নৌকা নাই, কূল নাই, মাঝে মাঝে ডাক আসে, "পার হ'য়ে এস"। অফেরো ভাবল "কি ক'রে এরা সব পার হবে? কত অন্ধ কত খঞ্জ, কত অক্ষম বৃদ্ধ, কত অসহায় শিশু, এরা সব পার হবে কি ক'রে"? যাঁরা বৃদ্ধ তাঁরা বল্লেন, "দূত আসবে। ডাক পড়বার সময় হলে, তখন তাঁর দূত আসবে।"

বল্‌তে বল্‌তে দূত এসে ডাক দিল। একটি ছোট মেয়ে ভুগে ভুগে রোগা হ'য়ে গেছে, সে নড়্‌তে পারে না চাইতে পারে না, দূত তাকে বলে গেল,—"তুমি এস, তোমার ডাক পড়েছে"। শুনে তার মুখ ফুটে হাসি বেরুল, সে উৎসাহে চোখমেলে উঠে বসল। কিন্তু হায়! অন্ধকার নদী, অকূল তার কালো জল, স্রোতের টানে ফেনিয়ে উঠ্‌ছে—সে নদী পার হবে কেমন ক'রে? জলের দিকে তাকিয়ে তার বুকের ভিতরে দুর্ দুর্ ক'রে উঠল। ভয়ে দুচোখ ঢেকে নদীর তীরে একলা দাঁড়িয়ে মেয়েটি তখন কাঁদ্‌তে লাগল। তাই দেখে সকলের চোখে জল এল, কিন্তু যেতেই যখন হবে তখন আর উপায় কি? মেয়েটির দুঃখে অফেরোর মন একেবারে গ'লে গেল। সে হটাৎ চীৎকার ক'রে বলে উঠল, "ভয় নাই—আমি আছি"। কোথা হ'তে তার মনে ভরসা এল, শরীরে তার দশগুণ শক্তি এল—সে মেয়েটিকে মাথায় ক'রে স্রোত ঠেলে আঁধার ঠেলে বরফের মত ঠাণ্ডা নদী মনের আনন্দে পার হ'য়ে গেল। মেয়েটিকে ওপারে নামিয়ে সে বল্ল, "যদি সেই ক্রুশের মানুষের দেখা পাও, তাঁকে বল, এ কাজ আমার বড় ভাল লেগেছে—যত দিন আমার ডাক না পড়ে, আমি তাঁর গোলাম হ'য়ে এই কাজেই লেগে থাকব।"

সেই থেকে তার কাজ হ'ল নদী পারাপার করা। সে বড় কঠিন কাজ! কত ঝড়ের দিনে কত আঁধার রাতে যাত্রীরা সব পার হয়—সে অবিশ্রাম কেবলই তাদের পৌঁছে দেয় আর ফিরে আসে! তার নিজের ডাক যে কবে আস্‌বে তা ভাববার আর তার সময় নাই।

একদিন গভীর রাত্রে তুফান উঠল। আকাশ ভেঙে পৃথিবী ধুয়ে বৃষ্টির ধারা নেমে এল। ঝড়ের মুখে স্রোতের বেগে পথঘাট সব ভাসিয়ে দিল—হাওয়ার পাকে পাগল হ'য়ে নদীর জল ক্ষেপে উঠ্‌ল। অফেরো সে দিন শ্রান্ত হ'য়ে ঘুমিয়ে পড়েছে—সে ভেবেছে এমন রাতে কেউ কি আর পার হ'তে চায়! এমন সময় ডাক শোনা গেল। অতি মিষ্টি কচি গলায় কে যেন বলছে, "আমি এখন পার হব"। অফেরো তাড়াতাড়ি উঠে দেখ্‌ল

ছোট্ট একটি শিশু ঝড়ের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে, আর বলছে, "আমার ডাক এসেছে, আমি এখন পার হব।" অফেরো বল্লে, "আহা! এমন দিনে তোমায় পার হ'তে হবে! ভাগ্যিস্ আমি শুনতে পেয়েছিলাম।" তারপর ছেলেটিকে কাঁধে নিয়ে "ভয় নাই" "ভয় নাই" বল্‌তে বল্‌তে সে দুরন্ত নদী পার হ'য়ে গেল।

কিন্তু এই বারেই শেষ পার। ওপারে যেমনি যাওয়া অমনি তার সমস্ত শরীর অবশ হ'য়ে পড়ল, চোখ যেন ঝাপসা হ'য়ে গেল, গলার স্বর জড়িয়ে এল। তারপর যখন সে তাকাল তখন দেখল, ঝড় নেই আঁধার নেই, সেই ছোট শিশুটিও নেই—আছেন শুধু এক মহা-পুরুষ, মাথায় তাঁর আলোর মুকুট। তিনি বল্লেন, "আমিই ক্রুশের মানুষ—আমিই আজ তোমায় ডাক দিয়েছি। এত দিন এত লোক পার করেছ, আজ আমায় পার করতে গিয়ে নিজেও পার হ'লে, আর তারি সঙ্গে সয়তানের পাপের বোঝা কত যে পার করেছ তা তুমিও জান না। আজ হ'তে তোমার অফেরো নাম ঘুচল; এখন তুমি Saint Christofer—সাধু খৃষ্টবাহন! যাও, স্বর্গের যাঁরা শ্রেষ্ঠ সাধু, তাঁদের মধ্যে তুমি আনন্দে বাস কর।"

চুপ রও!

এক ছিল ওস্তাদ দরজী। তার টাকাকড়ি ঘরবাড়ী কিছুরই অভাব ছিল না; তবু সে দরজীর ব্যবসা করত। তার ছিল একটি সুন্দরী মেয়ে, সে একেবারে ফুটফুটে ফুলের মত সুন্দর। সে ছাড়া তার আর কেউ নাই। যত রাজ্যের দরজির ছেলে, ওস্তাদের কাছে সবাই আসত কাজ শিখতে। তার মধ্যে একজন ছিল তার কাজ শিখবার ইচ্ছা মোটেও ছিল না, সব সময়ে সে অন্যমনস্ক থাকত, আর যখন তখন বকর বকর গল্প করত। তাকে ধমক দিয়ে শাসন করে কিছুতেই তার সংশোধন করা যেত না। এর উপর সে যখন একদিন ওস্তাদের মেয়েকে বিয়ে করতে চাইল, তখন ওস্তাদজী এমন ভয়ানক রেগে গেলেন, যে তিনি তাকে বাড়ী থেকে বের করে দিলেন, আর বল্লেন, "এই নেও তোমার ছুঁচ আর এই নেও তোমার সুতো। যতদিন তুমি ছয়টি মোহর রোজগার ক'রে আন্‌তে না পার, ততদিন তোমাকে আমার বাড়ীতে ঢুকতে দিব না। যেদিন ছয়টি মোহর আন্‌তে পারবে, সেইদিন আবার এস। তার আগে বিয়ের কথা মুখেও এনো না!"

বেচারী আর করে কি? সকলের কাছে বিদায় নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে পড়ল। কয়েকদিন ক্রমাগত পথ চলতে চলতে সে এক প্রকাণ্ড জঙ্গলে এসে পড়ল। সেখানে দেখতে দেখতে রাত হয়ে এল, সে কোথায় বা থাকবে কোথায় বা শোবে? শেষটায় একটা গাছের তলায় আগুন জ্বেলে ব'সে রইল। ব'সে থাকতে থাকতে কখন সে ঘুমিয়ে পড়েছে সে তা টেরও পায়নি—হঠাৎ গভীর রাত্রে চমকে উঠে দেখে তার আশেপাশে ছয় ছয়টা বেঁটে বামন। সে ধড়ফড় করে উঠে বল্‌ল "আপনারা কে?" যেমন বলা অমনি একটা বামন লাফিয়ে তার সামনে এসে বিকট রাক্ষসের মত চেহারা ক'রে প্রকাণ্ড এক কীল উঠিয়ে তাকে মারতে এল! তাই দেখে দরজি ভয় পেয়ে বল্‌লে "রাগ করেন কেন মশাই?—বল্‌তেই পটাপট্ পাঁচ কীল আর তিন থাপ্পড়! দরজীর কান ভোঁ ভোঁ করতে লাগ্‌ল, সে ভয়ে একেবারে কাঠের মত আড়ষ্ট হ'য়ে চুপ করে বসে রইল।

এমনি করে অনেকক্ষণ বসে থেকে তার বিরক্ত ধ'রে গেল। সে ভাবল একটা কিছু সেলাই করা যাক! এই ভেবে যাই সে তার পুঁটলি থেকে ছুঁচ সুতা বার করেছে অম্নি একটা বামন মহা খুসী হয়ে এক গাল হেসে কোত্থেকে এক ছেঁড়া জামা বার করে তাকে সেলাই করতে দিয়েছে। দরজী আর কি করে? সে দুঘণ্টা ধরে খুব যত্ন করে সেই

জামাটা সেলাই করল। তখন বামন ভারি খুসী হয়ে তাকে একটা মোহর দিল। মোহর পেয়ে দরজী যাই তাকে ধন্যবাদ দিতে যাবে অম্নি সে আবার সেই প্রকাণ্ড ঘুসি উঠিয়ে মারতে এসেছে! দরজী ভাবল ভালরে ভাল! আমি মেলা কথা কইতাম, তাই

ওস্তাদজি আমায় ধমকাতেন—এদের দেখছি চড়চাপড় ছাড়া কথা নেই। যা'হোক মোহরটা পেয়ে তার মনটা বড় খুসী হ'ল। সে ভাবল, আর পাঁচটা মোহর হলেই সে ওস্তাদের মেয়েকে বিয়ে করতে পারবে। এই রকম ভাবতে ভাবতে ভোর হ'য়ে এল, বামনরাও যাবার জন্য ব্যস্ত হ'ল। যাবার সময় তারা একটা কুঁজো থেকে সরবৎ ঢেলে দরজিকে খেতে দিল। দরজি বেচারা যেমন এক ঢোক সরবৎ গিলেছে অম্নি তার হাত পা গুটিয়ে ছোট হ'য়ে এল, সে একেবারে বেঁটে বামন হ'য়ে পড়ল; গায়ের জামা কাপড় সব ঢলঢলে ঢিলা হ'য়ে গেল। এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখে দরজি বেচারা চীৎকার করে কেঁদে উঠ্‌ল, কিন্তু যেমন চীৎকার করা অম্নি আবার সাংঘাতিক এক থাপ্পড়! সে একেবারে চিৎপাত হয়ে পড়ল। তখন বামনরা সবাই মিলে তার দিকে চোখ পাকিয়ে ঠোঁটে আঙ্গুল দিয়ে ঈসারা করে বল্‌ল "চুপ রও।"

তারপর খানিক পরামর্শ করে তারা ছয়জনে মিলে তাকে ধরে নিয়ে চল্‌ল। জঙ্গলের শেষে দুর্গের মত প্রকাণ্ড কালো পাহাড়, তারা সেই পাহাড়ের এক গর্ত্তের মধ্যে তাকে নিয়ে গেল। গর্ত্তের ভিতরে চমৎকার ঘরদুয়ার জিনিষপত্র—মনিমুক্তার দালান, তার মধ্যে চমৎকার গান বাজনা চলছে। সেইখানে একটা ঘরে সোণার খাটে রেশমের বিছানায় শুয়ে দরজি বেচারা ঘুমিয়ে রইল। সেকি যেমন তেমন ঘুম! একদিন গেল দুদিন গেল, এম্নি করে সাত দিন গেল, তারপর তার ঘুম ভাঙ্গল।

ঘুম থেকে উঠেই সে দেখে সেই বামনগুলো বসে আছে—কেবল যার জামা সেলাই হয়েছিল সে আসে নি। আবার একজন সেই আগের দিনকার মত একটা ছেঁড়া জামা দিল, আর দরজি তা সেলাই করে আবার একটা মোহর পেল। কিন্তু এবারে সে চালাক হয়েছে—আর সে যখন তখন কথা বলতে যায় না! খালি একবারটি মশায় কামড়েছিল ব'লে "উঃ" ক'রেছিল আর তাতেই এক থাপ্পড়ে তার দম বেরিয়ে এসেছিল। সে দিনও তারা সরবৎ খাইয়ে তাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে গেল।

এম্নি ক'রে লম্বা লম্বা ঘুম দিয়ে আর পাঁচ রাত সেলাই ক'রে সে পাঁচ মোহর রোজগার করল; আর একে একে পাঁচ বামন বিদায় হ'ল। তার পর যখন একজন মাত্র বামন বাকী আছে, তখন শেষবার সে সেলাই করছে, আর ভাবছে,—এইবারের মোহর জমা হ'লেই যেমন ক'রে হো'ক্ এই গর্ত্ত থেকে পালিয়ে যাব। এই ভাবতে ভাবতে যখন তার সেলাই শেষ হ'য়েছে—আর বামন তাকে মোহর দিতে যাবে—এমন সময় হটাৎ তার মনে পড়ে গেল, যে তার আর সেই আগের মত চেহারা নাই। এখন সে বিদ্‌ঘুটে বেঁটে বামন হ'য়ে গেছে—হয়ত ওস্তাদজি তাকে দেখলে চিনতেই পারবেন না। আর চিনলেই বা কি? সেই মেয়ে হয়ত তাকে আর পছন্দই করবে না। হয়ত সবাই তাকে ঠাট্টা করবে আর তাই দেখে মেয়েটিও হাসতে থাকবে! হায়, হায়, তখন কি হবে?

এই রকম ভাবতে ভাবতে তার দুই চোখ বেয়ে জল পড়তে লাগল, সে হটাৎ "ওরে বাবারে! আমার কি হ'লোরে" বলে হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠ্‌ল। কেঁদেই তার মনে হ'ল এইবার বুঝি বামন তাকে থাপ্পড় মারবে। কিন্তু, কি আশ্চর্য্য! মারা দূরে থাকুক বামন নিজেই এবার ভাঙাগলায় খন্ খন্ ক'রে বলে উঠ্‌ল, "কাঁদছ কেন? আর একটিবার সরবৎ খেয়ে দেখ দেখি"। দরজি দেখল বামন তাকে তরমুজের মত গোলাপী

রঙের সরবৎ এনে খেতে দিচ্ছে। "যা হয় হবে, খেয়ে ফেলি"—এই ভেবে সে ঢক্ ঢক্ ক'রে সরবৎ গিলে ফেল্ল।—

অমনি বোঁ বোঁ ক'রে তার মাথা ঘুরতে লাগ্‌ল, কানের মধ্যে ভন্ ভন্ ক'রে ঝঙ্কার দিয়ে উঠ্‌ল, আর ছায়ার মত কি যেন সব তার চোখের সামনে নাচতে লাগল, ঘর বাড়ী পাহাড় জঙ্গল দেখতে দেখতে কোথায় সব মিলিয়ে গেল। দরজী দেখল সে যেমন ছিল তেমনি আছে, আর তার চোখের সামনে সেই সহর, যেখানে তার ওস্তাদ থাকেন, আর তাঁর মেয়ে থাকে। সে তার পকেটে হাত দিয়ে দেখল, মোহরগুলা সব ঠিক আছে।

তখন আর কথা কি? সে এক দৌড়ে ওস্তাদের বাড়ী গিয়ে তার মোহর দেখিয়ে সকলের তাক্ লাগিয়ে দিল। তারপর বিয়ে আর ধূমধাম আর খাওয়াদাওয়ার ঘটা যে হ'ল সে খুবই আশ্চর্য্য। কিন্তু তার চাইতেও আশ্চর্য্য এই যে সেদিন থেকে তার স্বভাবটি একেবারে বদলে গেল। এখন থেকে যখনই সে মেলা বাজে কথা বল্‌তে যায়, তখনই তার মনে হয় যেন রাক্ষসের মত চেহারা ক'রে বামন তাকে চোখ পাকিয়ে বল্‌ছে—"চোপ্ রও"!

শ্রীইলা রায়।

পুরাতন লেখা।

BENGAL LIBRARY

(৺উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী লিখিত)

আকাশ।

আমরা নিতান্ত ছোট, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস যে, আমরা খুব বড়। আমরা ভাবি, "আমরা যে মানুষ! আহা, আমাদের মতন আর একটী জন্তু বুঝি হয় না! আমাদের যে পৃথিবী,—ইস্! সে কত খানি বড়!" কিন্তু আমরা যে যথার্থই কত ছোট, তাহা বুঝাইয়া দিবার জন্য ঈশ্বর আকাশকে রাখিয়াছেন। দেখ, ওখানে কত সূর্য্য। ঐ সকল সূর্য্যের সঙ্গে কত পৃথিবী আছে! আর, তাহাতে মানুষের মতন, বা, তাহার চাইতে ঢের বেশী বুদ্ধিমান্ জীব থাকা কোন মতেই অসম্ভব নহে। উহারা হয়ত আমাদের চাইতে ঢের বেশী কথা জানে, আর এখানকার দূরবীণের চাইতে অনেক বড় বড় দূরবীণ দিয়া আকাশ দেখে। কিন্তু আমাদের খবর কি তাহারা পাইয়াছে? তাহার ভরসা নিতান্তই কম বলিতে হইবে। উহাদের মধ্যে যাহারা আমাদের একটু কাছে থাকে, তাহারা হয়ত

আমাদের সূর্যকে একটী ছোট তারার মত দেখিতে পায়। কিন্তু ইহার বেশী দেখা সম্ভব নহে। পৃথিবী, চন্দ্র, বুধ, বৃহস্পতির কথা তাহারা কিছুই জানে না।

আর মানুষ? হায়, হায়, আমাদের কথাও তাহারা জানে না! কোন দিন যে জানিবে তাহারও আশা নাই। ডাকিলে ত উহারা শুনিবেই না। পৃথিবীর সকল মানুষ যুটিয়া চ্যাঁচাইলেও শুনিবে না। চিঠি লিখিয়াও জানাইবার উপায় নাই। চিঠি কে লইয়া যাইবে? কোন্ পথে যাইবে? আর যদিই বা লোক মিলে আর পথ হয়; তবে সে চিঠি কয় দিনে পৌঁছাইবে? তোমার চিঠিওয়ালা যদি রেলে চড়িয়া ঘণ্টায় ৬০ মাইল করিয়া যায়, তাহা হইলেও সকলের চাইতে কাছের তারাটীতে সে সাড়ে চারি কোটি বৎসরের কমে পৌঁছাইতে পারিবে না! সেই চিঠির জবাব আসিতে আর সাড়ে চারি কোটি বৎসর লাগিবে।

আদব কায়দা।

যদি বিদেশে যাও, তবে ভাই সে দেশের আদব কায়দা কিঞ্চিৎ শিখিয়া লইও। নচেৎ, তুমি হাজার ভদ্রলোক হও, সেখানকার লোকেরা তোমাকে অসভ্য মনে করিবে। লোকে কথায় বলে, "যে দেশের যে রীতি।" কথাটি অতিশয় উত্তম। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, রীতিগুলি মাঝে মাঝে কেমন একটু বেখাপ্পা হয়। এক দেশের লোকে নমস্কার করে, অন্য দেশের লোকে সেলাম করে, আর এক দেশের লোকে হাতে ধরিয়া হ্যাঁচ্‌কা টান দিয়া কাঁধে বেদনা ধরাইয়া দেয়। আবার আর এক দেশের লোকেরা ইহার কোনটার মধ্যেই ভদ্রতার লেশ মাত্র দেখিতে পায় না। তাহার দেশের ভদ্রতা হচ্ছে, নাকে নাকে ঘষিয়া দেওয়া। ইহাতে যদি তোমার পছন্দ না হয়, তবে এক সাহেবের কথা শুন। সাহেব আফ্রিকা দেশের এক রাজার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন। সাহেবকে দেখিবামাত্র রাজা অতিশয় বন্ধুভাবে সাহেবের কাছে আসিয়া তাঁহার হাত খানি টানিয়া লইলেন। সাহেব মনে করিলেন, বুঝি রাজা হেণ্ড্‌শেক্ করিবেন, কিন্তু রাজা তাহার কিছুই করিলেন না। রাজা সাহেবের সেই হাতে অতিশয় যত্নের সহিত যারপরনাই পরিপাটি করিয়া এক গাল অতি সরেস থুথু ফেলিলেন। সাহেব ভারী বুদ্ধিমান লোক, অনেক রাজা রাজড়ার দরবার করিয়াছেন; সুতরাং তিনি একটুও ভড়্‌কাইলেন না; তিনি তৎক্ষণাৎ রাজা মহাশয়ের একখানি হাত টানিয়া লইয়া তাহাতে ঠিক ঐরূপ করিয়া থুথু ফেলিলেন। রাজা মহাশয় বুঝিলেন যে, "লোকটা খুব ভদ্রতা জানে।" সুতরাং তিনি সাহেবের উপর খুব সন্তুষ্ট হইলেন! আর এক দেশের লোকেরা সম্মানিত

অতিথির গালে সাদা আর কালো রং মাখাইয়া তাঁহার সমাদর করে। অতিথির উচিত হয় আবার ঐ রঙের খানিকটা লইয়া গৃহস্বামীর গালে মাখাইয়া দেওয়া। নইলে আমার নমস্কার পাইয়া তুমি আমাকে ফিরিয়া নমস্কার না করিলে আমি যেরূপ মনে করিতে পারি উহারাও তাহাই করে। আমি হয়ত তোমার উপরে চটিয়া তোমার সঙ্গে কথা বার্ত্তা বন্ধ করিতে পারি - কিন্তু উহারা সম্ভবতঃ সেই অতিথির ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে পোড়াইয়া খাইবে।

জানোয়ারের প্রবাস যাত্রা।

গ্রীষ্ম আসিতেছে—তোমরা কতজনে হয়ত এখন হইতেই তাহার কথা ভাবিতেছ! কবে ছুটি হইবে, তারপর কে কোথায় যাইবে, কেমন করিয়া সময় কাটাইবে, ইত্যাদি কত কথা। গ্রীষ্মের সময়ে যে দেশে গরম কম, সেই দেশে যাইতে ইচ্ছা করে, তাই লোকে সিমলা যায় দার্জ্জিলিং যায় শিলং যায়। এরকমে দেশ ছাড়িয়া পালাইবার ইচ্ছা কেবল যে আমাদেরই হয় তাহা নয়, পশুপক্ষী সকলেরই মধ্যে কিছু কিছু দেখা যায়।

শীতের দেশের পাখী, যাহারা হিমালয়ের উত্তরে সারা বছর কাটায়, তাহারা প্রতি বছর শীতকালে আমাদেরই গরম দেশে হাওয়া খাইতে আসে। কোথায় হিমালয় আর কোথায় এই বাংলা দেশের দক্ষিণ; অথচ বছরের পর বছর কত হাঁস কত বক এই লম্বা পথ পার হইয়া আসে, আবার শীতের শেষে ঠিক নিয়মমত সময়ে হিমালয় ডিঙাইয়া দেশে ফিরিয়া যায়। কোথা হইতে যে তাহারা এদেশের সন্ধান পায়, আর কেমন করিয়াই বা এতখানি পথ চিনিয়া আসে, তাহা কে বলিতে পারে? এরকম যাওয়া আসা পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই দেখা যায়। গরম দেশের পাখী গ্রীষ্মের ভয়ে ঠাণ্ডা দেশে চলিয়াছে; আবার ঠাণ্ডা দেশের পাখী শীতের তাড়ায় গরম দেশে শীতকাল কাটাইতেছে। আশ্চর্য্য এই যে, এসকল পাখী এমন ভরসার সঙ্গে হিসাবমত চলাফিরা করে যে মনে হয় যেন পথঘাট সবই তাহার জানা আছে। যেখানে পথঘাটের কোন চিহ্ন নাই, রাস্তা চিনিবার কোন উপায়ও নাই, সেই অকূল সমুদ্রের মধ্য দিয়াও তাহারা নির্ভয়ে পথ বুঝিয়া চলে। মেঘ বৃষ্টি কুয়াশায় অন্ধকারে কিছুতেই তাহারা পথ ভুলে না। এইরূপে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ পাখী মাস ঋতুর হিসাব রাখিয়া আকাশে পাড়ি দিয়া ফেরে!

এত গেল পাখীর কথা। বড় বড় ডাঙ্গার জন্তু ও যে এইরূপে দল বাঁধিয়া প্রবাস যাত্রা করে, এরকমত কত সময়েই দেখা যায়! জেব্রা জিরাফ হাতী হরিণ বুনোমহিষ ইহারা সকলেই সময় মত এ বন ও বন ঘুরিয়া বেড়ায়। আমেরিকার বাইসনগুলা যখন শীতের সময় বড় বড় দেশ পার হইয়া সবুজ বন আর তাজা ঘাসের সন্ধানে যাত্রা করে তখন তাহারা একেবারে মাইলকে মাইল পথ জুড়িয়া চলে। এক সময়ে এই বাইসনের চলাফেরা আমেরিকায় সহজেই দেখা যাইত কিন্তু নানাকারণে এখন বাইসনের সংখ্যা খুব কমিয়া আসিয়াছে। তাহার মধ্যে মানুষের অত্যাচার খুব একটা বড় কারণ বলিতে হইবে। যখন বড় বড় দল গোঁ ভরে নদীজল ভাঙ্গিয়া মাঠ ঘাট পার হইতে থাকে

তখন যাহারা দুর্ব্বল, যাহারা চলিতে পারে না, তাহাদের অনেকে পিছে পড়িয়া যায়। সেই সময়ে নানারকম মাংসাশী জন্তু আসিয়া তাহাদের মারিয়া শেষ করে। কিন্তু তবু মানুষে অত্যাচার না করিলে এখনও তাহারা লাখে লাখে মাঠে মাঠে ঘুরিয়া বেড়াইত! মানুষ কয় বৎসর সেখানে বসবাস না করিতেই পঞ্চাশ লক্ষ বাইসন খাইয়া হজম করিয়াছে। এক এক দল লোক এক একবারে দশ বিশ হাজার বাইসন মারিয়া তবে ছাড়ে।

হাতীরা দল বাঁধিয়া বনে বনে ঘুরিয়া বেড়ায় এরূপ অনেক সময়েই দেখা যায় কিন্তু

সেটা কেবল খাবার সংগ্রহের চেষ্টামাত্র। দেশ ছাড়িয়া লম্বা দৌড় দেওয়ার অভ্যাসটা তাহার নাই। অর্থাৎ আজ কাল নাই। হাতীর যাহারা পূর্ব্বপুরুষ, তাহারা যে দেশ বিদেশ বিচরণ করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করে নাই তাহার ঢের প্রমাণ পাওয়া যায়। ইংলণ্ড বল আমেরিকা বল গ্রীষ্মপ্রধান আফ্রিকা বল আর শীতপ্রধান সাইবিরিয়া বল, সকল স্থানেই জীবন্ত হাতী না পাও হস্তী জাতীয় জন্তুর কঙ্কালচিহ্ন পাইবে। আফ্রিকার উত্তরদিকে ইজিপ্টের মধ্যে বহু পুরাতন একটা শূকরের মত জানোয়ারের কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে, পণ্ডিতেরা বলেন সেই নাকি হাতীর একজন পূর্ব্বপুরুষ। বিদেশ ভ্রমণ কাহাকে বলে তাহা এই জানোয়ারের বংশধরেরা খুব ভাল করিয়াই দেখাইয়া গিয়াছে। হাতীর কথা বলিতে গেলে আপনা হইতেই ঘোড়ার কথা মনে আসে। হাতীর মত ঘোড়াও, অর্থাৎ তাহার পূর্ব্বপুরুষও, এক সময়ে পৃথিবীময় ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে! কিন্তু সে ঘোড়া আর আজকালকার মানুষের পোষা ঘোড়ায় আকাশ পাতাল তফাৎ—ঠিক যেমন নেকড়ে বাঘ আর সৌখিন কুকুরের প্রভেদ।

হরিণের দলবাঁধিয়া চলার কথা বোধ হয় সকলেই জান! বড় বড় শিংওয়ালা হরিণগুলা যখন প্রকাণ্ড দল বাঁধিয়া নদী পার হইতে থাকে, সে নাকি এক চমৎকার দৃশ্য। নদীর এপার হইতে ওপার পর্য্যন্ত কেবল হরিণের মাথা আর হরিণের শিং! মনে হয় যেন

জীবন্ত সাঁকো ফেলিয়া নদীর জলে বাঁধ দেওয়া হইয়াছে। পাঁচ দশ হাজার হরিণ

এইরূপে এক সঙ্গে বাহির হয়। প্রায়ই দেখা যায় তাহারা এমন নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট পথে যাতায়াত করে যে শিকারীরা আগে হইতে আন্দাজ করিয়া সময় মত ঠিক জায়গায় ঘাপ পাতিয়া বসিয়া থাকে। ছবিতে যে হরিণের দল দেখিতেছ ইহার নাম কারিবু—বাড়ী আমেরিকায়।

কিন্তু জানোয়ারের বিদেশ যাত্রার কথা বলিতে গিয়া যদি কেবল বড় বড় জানোয়ারের কথাই বলি তবে আসল কথাটাই বাদ থাকিয়া যাইবে। এ সম্বন্ধে যত আশ্চর্য্য কথা শুনিয়াছি তাহার মধ্যে সব চেয়ে আশ্চর্য্য লাগে লেমিঙের কথা।

পাহাড়ের ধারেযেখানে সবুজ গাছ আর কচি পাতার অভাব নাই, সেইখানে গর্ত্ত করিয়া লেমিং বাস করে। দেখিতে তাহারা ইঁদুরের চাইতে বড় নয়, চেহারাও সেইরকম—কেবল লেজ নাই বলিলেই হয়। আর বিশেষ আশ্চর্য্য তাহাদের বংশবৃদ্ধি। যেখানে আজ দেখিবে ক্বচিৎ দুদশটা লেমিং দেখা যায়, বৎসরেক বাদে গিয়া দেখিবে লেমিঙের বংশে পাহাড় ছাইয়া ফেলিয়াছে! সংখ্যায় যত বাড়ে, তত তারা গাছ পালা খাইয়া শেষ করে। শেষে এমন অবস্থা হয় যে আর সব্জী জোটে না। পাহাড়কে পাহাড় একেবারে নেড়া হইয়া যায়। তখন ঘোর দুর্ভিক্ষের মধ্যে ক্ষুধার যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া তাহারা ব্যস্ত হইয়া বেড়ায়! মনে হয়, যেন তাহাদের মধ্যে খুব

একটা তুমুল আন্দোলন চলিয়াছে, যেন তাহারা কোনরূপে পরামর্শ স্থির করিতে পারিতেছে না। তার পর একদিন কি ভাবিয়া তাহারা একেবারে দলেবলে পাগলের মত দেশ ছাড়িয়া পলাইতে আরম্ভ করে।

সে এক দেখিবার মত জিনিষ। লক্ষ লক্ষ ইঁদুর একেবারে পাহাড় কাল করিয়া নামিতে থাকে। কোথায় যাইবে, কোথায় খাবার মিলিবে, সে খবর কেহ জানে না অথচ একেবার নিরুদ্দেশ অন্ধের মত সকলে হুড়াহুড়ি করিয়া বাহির হয়। বাধা মানে না, বিপদ মানে না, সব হুড়হুড় করিয়া অগ্রসর হইতে থাকে। ঠেলাঠেলিতে পায়ের চাপে কত হাজার হাজার মারা পড়ে, অনাহারে পথের ধারে আরও কত হাজার মরিয়া থাকে। আর নদীর স্রোতে, সমুদ্রের ঢেউয়ে কত যে প্রাণ হারায়, বুঝি তাহার আর সংখ্যা হয় না। যত রাজ্যের মাংসাশী শিকারী পাখী তখন চারিদিক হইতে আকাশ অন্ধকার করিয়া আসিতে থাকে। এম্নি করিয়া অজস্র লেমিং বিনষ্ট হইবার পর যে কয়টি অবশিষ্ট থাকে তাহারাই আবার আর কোনখানে নূতন করিয়া বংশসৃষ্টির সূত্রপাত করে। ক্রমে আবার সেই সংখ্যাবৃদ্ধি, সেই দুর্ভিক্ষ আর সেই প্রলয় কাণ্ড!

ছোটর কথা বলিলাম, এখন আরও ছোটর কথা বলিয়া শেষ করি। পিঁপড়ারা যে বাসা ছাড়িয়া নূতন দেশের সন্ধানে বাহির হয়, ইহা সকল দেশেই দেখা যায়। এ বিষয়ে সকলের চাইতে ওস্তাদ যে পিঁপড়া তাহার নাম ড্রাইভার পিঁপ্‌ড়া। আফ্রিকার জঙ্গলে ইহারা যখন ঠিক সৈন্যদলের মত পরিষ্কার সার বাঁধিয়া চলিতে থাকে তখন জানোয়ার মাত্রেই তাহাকে দেখিয়া পথ ছাড়িয়া পালায়। যে আহাম্মক জন্তু এরূপ না করে, তাহার কিরূপ দুর্দ্দশা হয়—তাহার গল্প একবার সন্দেশে বলা হইয়াছে।

আর পঙ্গপালের কথা কে না জানে? যে দেশের উপর দিয়া পঙ্গপাল যায়, সে দেশের চাষারা মাথায় হাত দিয়া হায় হায় করিতে থাকে। সে দেশে শস্য আর গাছের পাতা বড় বেশী অবশিষ্ট থাকে না। দশ বিশ মাইল লম্বা পঙ্গপালের দল ত সচরাচরই দেখা যায়; এক একটা দল এত বড় থাকে যে মাথার উপর দিয়া সপ্তাহ খানেক উড়িয়াও তাহার শেষ হয় না! আফ্রিকায় এই রকম বড় বড় কাণ্ড প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। সেখানে পঙ্গপালের চাপে পড়িয়া টেলিগ্রাফের তার ছিঁড়িয়া পড়ে, পুকুর বুজিয়া যায়, ড্রেন আটকাইয়া যায়,—এমন কি রেল গাড়ী বন্ধ হইয়া যায়, এমনও দেখা গিয়াছে।

ঘুড়ি ও ফানুষ।

জলের চাইতে হাল্কা জিনিষ যেমন জলে ভাসে, বাতাসের চেয়ে হাল্কা জিনিষ তেমনি বাতাসে ভাসে। আগুণের উপরকার তপ্ত বাতাস, সাধারণ ঠাণ্ডা বাতাসের চাইতে অনেক পাৎলা ; তাই সে উপরে উঠে—আর সেই উপরমুখী স্রোতের টানে যত রাজ্যের কয়লা ধূলা সবশুদ্ধ টেনে তোলে। সেই কয়লাধূলাশুদ্ধ ময়লা বাতাসের স্রোতকে আমরা বলি ধোঁয়া।

এই রকম হাল্কা ধোঁয়াকে পাৎলা থলির মধ্যে পুরে আমরা তাকে আকাশে ওড়াই —আর সেই কাগজের থলিকে বলি ফানুষ। সেই ফানুষ যদি খুব বড় হয়, আর মজবুৎ ক'রে তৈরী হয়, তখন তাকে বলি 'বেলুন'।

এ ত গেল হাল্কা জিনিষের কথা। কিন্তু বাতাসের চাইতে ভারি জিনিষও অনেক সময়ে আকাশে ওঠে—যেমন ঘুড়ি। চলন্ত বাতাসের কেমন একটা ধাক্কা দিবার শক্তি আছে, সে বড় বড় ভারি জিনিষকেও ঠেলে তোলে। ঘূর্ণী বায়ুর সময়ে বাতাসের জোর যখন খুব বেড়ে ওঠে, তখন তার ধাক্কায় ঘরবাড়ী পর্য্যন্ত উড়িয়ে নেয়। ঘুড়ির সূতায় যতক্ষণ টান থাকে ততক্ষণ আপনা হতেই বাতাসের ধাক্কায় ঘুড়িকে উপরদিকে ঠেলে রাখে, কিন্তু বাতাস যখন থেমে আসে তখন ঘুড়ির সূতো ধরে ক্রমাগত টান না দিলে সে বাতাসের ধাক্কাও পায় না, কাজেই তার উপর ভর ক'রে উঠতেও পারে না।

ফানুষকে বাড়িয়ে যেমন প্রকাণ্ড বেলুনের সৃষ্টি হ'য়েছে, তেমনি সাধারণ ঘুড়ির "পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ" হ'চ্ছে মানুষ-তোলা ধাউস্ ঘুড়ি। এরোপ্লেনের সৃষ্টি হবার আগে লোকে এই রকম ঘুড়িতে চ'ড়ে নানা রকম পরীক্ষা ক'রে

দেখেছে। এরকম ক'রে শত্রুর চালচলন দেখবার জন্য নানা রকম ব্যবস্থাও করা হ'য়েছে। এর অসুবিধা এই যে বাতাসের জোর না থাকলে কিছু করবার উপায় নাই। তা ছাড়া ঘুড়ি মাত্রেই এক জায়গায় আটকা থাকে, তার পক্ষে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ান সম্ভব নয়। সুতরাং ঘুড়িই বল আর ফানুষই বল সকলেই বাতাসের খেয়ালের অধীন।

মানুষ অনেক কাল হতেই চায়, পাখীর মত আকাশে উড়্‌তে। কেবল ফানুষে চড়ে বা ঘুড়িতে উঠে হাওয়ার ঠেলায় ভেসে বেড়িয়ে তার মন উঠে না। পাখীর নকল ক'রে বড় বড় ডানা বানিয়ে তার সাহায্যে উড়ে বেড়াবার চেষ্টা অনেক দিন হ'তেই চলে আস্‌ছে। হাতে পিঠে ডানা লাগিয়ে লোকে সাহস ক'রে পাহাড় থেকে লাফিয়ে পড়েছে—আর তাতে কত জনের প্রাণও গিয়েছে। লিলিয়েন্থেল প্রভৃতি যাঁরা এই বিষয়ে বেশ কৃতকার্য্য হ'য়েছিলেন, তাঁরাও অতিরিক্ত সাহস করতে গিয়ে শেষে মারা পড়েন। তবু লোকে এ বিষয়ে পরীক্ষা করতে ছাড়েনি। পরীক্ষার ফলে মোটের উপর এইটুকু বোঝা গেছে যে পাখীর মত ডানা ঝাপটিয়ে ওড়া মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়—তবে বাতাস ভাল থাকলে একটু উঁচু জায়গা থেকে আরম্ভ করে অনেকদূর পর্য্যন্ত হাওয়ায় ভেসে যাওয়া যায়। শুধু ভেসে যাওয়া নয়, অনেক সময় ডাইনে বাঁয়ে এদিক ওদিক একটু আধটু ঘোরা ফিরাও সম্ভব হয়। এ বিষয়ে আমেরিকার দুটি ভাই—অর্ভিল ও উইলবার রাইট—সকলের চেয়ে বাহাদুরি দেখিয়েছেন। তাঁরা তাঁদের তৈরী ডানার সাহায্যে দশ বিশ মাইল পর্য্যন্ত অনেকবার ঘুরে এসেছেন। কিন্তু এতে ক'রে উপর থেকে নীচে নামা বেশ সহজ বটে, কিন্তু বাতাস ঠেলে উপরে ওঠা এক রকম অসম্ভব বল্লেই হয়। ঘুড়ির যখন সূতো ছিঁড়ে যায়, তখন সে পাথরের মত ধপ্ ক'রে না প'ড়ে কেমন ভেসে ভেসে হেলে দুলে এগিয়ে পড়ে। নানা কৌশল খাটিয়ে নানা

রকম আকারের ঘুড়িকে এইভাবে বাতাসে ভাসিয়ে কত হাজার রকম পরীক্ষা ক'রে দেখা হ'য়েছে ; এবং তার ফলে এটুকু বোঝা গেছে যে জাহাজ যেমন ক'রে জল কেটে এগিয়ে চলে, তেম্নি ক'রে যদি বাতাস কেটে ঘুড়িকে ঠেলে নেওয়া যায় তবে হয়ত তাকে যেদিক ইচ্ছা সেদিকে চালান যেতে পারে। এই চেষ্টার ফলে যে জিনিষ দাঁড়িয়েছে তারই নাম এরোপ্লেন।

এরোপ্লেনের চেহারা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলবার দরকার নাই কারণ তার ছবি তোমরা অনেক দেখেছ। কিন্তু সেটা যে একটা ঘুড়িমাত্র একথাটা তার পাখীর মত চেহারা দেখে সব সময়ে মনে আসে না। কিন্তু বাস্তবিক সেটা ঘুড়ি ছাড়া আর কিছুই নয়। ঘুড়িকে ওড়াতে হ'লে যেমন সূতো ধ'রে টানা দরকার, এরোপ্লেনকে ঠিক তেমনি বাতাস ঠেলে কলের জোরে টান্‌তে হয়। সুতরাং ঘুড়িতে যত রকম বদভ্যাস আর কেরামতি দেখা যায়, এরোপ্লেনেও প্রায় সেই রকম। ঘুড়ির মত সেও বেখাপ্পা 'গোঁৎ' খেতে চায়, হঠাৎ শূন্যের মাঝে কাৎ হ'য়ে পড়্‌তে চায়, আর এলোমেলো বাতাসে ঘুরপাক খেয়ে উল্টাতে চায়। এত রকম তাল সামলে তবে এরোপ্লেন চালান শিখ্‌তে হয়। ঘুড়িতে যদি বেখাপ্পা জোরে হ্যাঁচকা টান দেও তবে সে যেমন ফস্ করে ফেঁসে যেতে পারে, এরোপ্লেনও তেমনি ডানা ভেঙ্গে ধপ্ করে পড়ে যাওয়া কিছু বিচিত্র নয়। যারা এবিষয়ে ওস্তাদ, তাদের কাছে এরোপ্লেনের এসব পাগলামি নিতান্তই সামান্য ব্যাপার ; তারা ইচ্ছা ক'রেই কত সময় এরোপ্লেনশুদ্ধ শূন্যে ডিগবাজি খেয়ে তামাসা দেখায়, এরোপ্লেনকে নানা রকমে গোঁৎ খাওয়ায়।

ঘুড়ি আর ফানুষে যে তফাৎ, 'এরোপ্লেন' আর 'এয়ারশিপ' বা আকাশ-জাহাজে ঠিক সেই তফাৎ। ফানুষকে অর্থাৎ বেলুনকে ইচ্ছামত এদিক ওদিক চালাবার চেষ্টাতেই আকাশ-জাহাজের সৃষ্টি। গোল বেলুন বাতাসের উল্টোমুখে চলতে গেলে চ্যাপ্টা হ'য়ে যায়, তাই তাকে চমচমের মত ছুঁচাল ক'রে বানায়—তাহ'লে সে সহজেই বাতাস ফুঁড়ে এগুতে পারে। তার পিছনে হাল ও আশে পাশে মাছের ডানার মত ডানা থাকে—তা দিয়ে জাহাজকে ইচ্ছামত ডাইনে বাঁয়ে উপর নীচে চালান যায়। আর থাকে বিদ্যুতের পাখার মত মস্ত একটা ঘুরন্ত জিনিষ ; সেইটার ধাক্কায় বাতাস ঠেলে জাহাজ চলে। এরোপ্লেনেও অবশ্য ঠিক এই রকম পাখা থাকে।

এই যুদ্ধের সময়ে এরোপ্লেন আর এয়ারশিপগুলি কি রকম কাজে লেগেছে তার সম্বন্ধে দু একটি কথা বলি। এরোপ্লেনগুলা চলে ব্যস্তবাগীশের মত ফরফর ক'রে,

এরোপ্লেন আর আকাশ জাহাজের লড়াই।

তারা দিনদুপরে যখন তখন যেখানে সেখানে উড়ে যায় আর নানা রকম খবর আনে। দরকার হ'লে ধাঁ ক'রে শত্রুর শিবিরে বা গোলাবারুদের গুদামে বা অস্ত্রের কারখানায় দুদশটা বোমা ফেলে আসে, অথবা বন্দুক দিয়ে শত্রুর এরোপ্লেন বা জাহাজ আক্রমণ করে। এসব ছোট খাট কাজে এরোপ্লেনেই সুবিধা বেশী। দশ বছর আগে বিলাতের লোকেও এরোপ্লেন জিনিষটাকে একটা আশ্চর্য্য তামাসার ব্যাপার মনে করত, অথচ এখন এই যুদ্ধে কত হাজার হাজার এরোপ্লেন ঘোরা ফিরা করে—কে তার খবর রাখে?

আকাশ-জাহাজগুলা প্রকাণ্ড গম্ভীর জিনিষ, একেবারে ২০।৩০ মণ বোমা নিয়ে ফেরে! তার উপর কামান বন্দুকও সঙ্গে থাকে। তারা আসে যায় অন্ধকার রাত্রে চোরের মত—দিনের বেলা বেরুতে গেলে তাদের আর রক্ষা নেই—কারণ অত বড় জিনিষকে গোলা মেরে ফুঁটো করতে কতক্ষণ? রাত দুপুরে যখন তারা ঘুমন্ত সহরের উপর বোমা ফেলতে থাকে—তখন চারদিক হ'তে বড় বড় 'search light'এর আলোর ধারা আকাশ হাতড়ে তাকে খুঁজে বেড়ায়। একবারটি তার উপর আলো ফেলতে পারলেই যত রাজ্যের কামান তার উপর তাক্ করতে থাকে। তারপর চারিদিক হতে এরোপ্লেনগুলা ভীমরুলের মত ঘিরে আসে! তখন জাহাজটিকে প্রাণ নিয়ে পালাতে হয়। ছবিতে দেখ একটা এরোপ্লেন আর একটা বড় জাহাজে লড়াই হচ্ছে। এ রকম অবস্থায় এরোপ্লেনের সর্ব্বদাই চেষ্টা থাকে জাহাজের উপরে উঠবার জন্য। কারণ উপর থেকে বোমা ফেলে তার পিঠ ভেঙ্গে দেওয়াই হ'চ্ছে জাহাজ মারবার সব চাইতে ভাল উপায়। ফানুষ জাহাজ যত উঁচুতে যেমন তাড়াতাড়ি উঠতে পারে, ঘুড়ির নৌকা তেমন পারে না; কাজেই জাহাজ কাছে আসবার আগে থেকেই এরোপ্লেন অনেকখানি উঠে থাকে—যাতে ঠিক সময়ে সে জাহাজের ঘাড়ের উপর নামতে পারে।

আবোল তাবোল।

হুঁকোমুখো হ্যাংলা বাড়ী তার বাংলা
মুখে তার হাসি নাই—দেখেছ?
নাই, তার মানে কি? কেউ তাহা জানে কি?
কেউ কভু কাছে তারে ডেকেছ?
শ্যামাদাস মামা তার আফিঙের ধামাদার—
আর তার কেহ নাই এ ছাড়া;

আবোল তাবোল।

তাই বুঝি একা সে মুখখানা ফ্যাকাসে
ব'সে আছে কাঁদ' কাঁদ' বেচারা ?
থপ্ থপ্ পায়ে সে নাচত যে আয়েসে
গালভরা ছিল তার ফূর্ত্তি !
গাইত সে সারাদিন 'সারে গামা টিম্ টিম্'
আহ্লাদে গদ গদ মূর্ত্তি !!

এই ত সে দুপ'রে বসে ওই উপরে
খাচ্ছিল কাঁচকলা চট্‌কে—

এর মাঝে হল কি ? মামা তার ম'ল কি ?
অথবা কি ঠ্যাং গেল মট্‌কে ?
হুঁকোমুখো হেঁকে কয় "নয় নয় তাও নয়
দেখছ না কিরকম চিন্তা !
মাছি মারা ফন্দি এ যত ভাবি মন দিয়ে
ভেবে ভেবে কেটে যায় দিনটা।
বসে যদি ডাইনে লেখে মোর আইনে
এই ল্যাজে মাছি মারি এস্ত—
বামে যদি বসে তাও নহি আমি পিছপাও
ওই ল্যাজ আছে তার অস্ত্র !
যদি দেখি কোন পাজি বসে ঠিক মাঝা মাঝি
কি যে করি, শেষ নাই ভাবনার—
ভেবে দেখ ভারি দায় কোন্ ল্যাজে মারি তায়
দুটি মোটে ল্যাজ মোর আপনার।"

মাঘ মাসের ধাঁধার উত্তর দাতাদের নাম—

ফণিন্দ্রনাথ বসু, সুধীরকুমার মল্লিক, শ্রীপতি গুপ্ত, প্রফুল্লনাথ চৌধুরী, তুহিনকুমারী দত্ত, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, প্রকৃতি দেবী, বিভূতিভূষণ বসু, গোবিন্দপ্রসাদ ঘোষ, সুবোধচন্দ্র পাল, বিজয়েন্দ্রনাথ ঘোষ, প্রতিভা দেবী, মহম্মদ রেজা করিম, বিমলচন্দ্র উকিল, বণিক লাইব্রেরী (রঙ্গপুর), হীরেন্দ্রনাথ রায়, অতুলকৃষ্ণ পাল, শচীন্দ্রনাথ বসুমল্লিক, দিনবন্ধু আচার্য্য, শরদিন্দু বসু, অসীমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র নাথ, জগন্নাথ মুখোপাধ্যায়, হেমন্তকুমার মিত্র, অমিয়বালা রায়, বাসন্তী দেবী, কুসুমকুমারী দে, শান্তিময়ী দেবী, জ্যোৎস্না ঘোষ, অনন্তমোহন চট্টোপাধ্যায়, অমিয়কুমার পাইন, বনবিহারী আদক, শ্রীশচন্দ্র পুরকায়স্থ, বিজনবালা দেবী, ননীগোপাল ঘোষ, শৈলেশ্বর চক্রবর্ত্তী, হীরালাল সাহা, সুধাংশুভূষণ সেন, লতিকা দেবী, সুশীলকুমার বসু, হীরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্যচৌধুরী, ক্ষেমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপদ বৈদ্য, কাশীনাথ ভট্টাচার্য্য, পারুলবালা সেন, কমলকুমারী মিত্র, শচীবালা দেবী, সুধাকণা সরকার, আদিত্যসাধন মুখোপাধ্যায়, সরোজাক্ষ সেন, সুজাতা রায়, শৈলেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, ইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়, জ্যোতিপ্রকাশ ঘোষ, শিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, মেঘেন্দ্রলাল সরকার, ললিতকুমার মুখোপাধ্যায়, সরলকুমার মিত্র, শচীন্দ্রমোহন নন্দী, স্নেহশীলা রায়, প্রভাতচন্দ্র বসু, ভবেশ্বর মুখোপাধ্যায়, কাজী আব্‌দুল কুদ্‌দুস।

৺উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত

IMPERIAL LIBRARY
APR -6 1921

চতুর্থ বর্ষ ১৩২৩

সূচী পত্র।

বিষয়	পৃষ্ঠা
অজানা দেশ	১৭৩
অদ্ভুত কাঁকড়া	১৮৪
অসুরের দেশ	৩১০
আবোল তাবোল	৯৪,১২৫,১৫৭,৩৮২
আশ্চর্য্য কবিতা	৫৬
উচিত বিচার	২০৬
উল্টা বুঝলি রাম	২১
ঊষা ও অনিরুদ্ধ	৫০
এক হল' দুই	১৪৯
কপিলাশ	১০২
কয়েকটি ছবি	৬৩
কাক	৬
কাঁকড়া বিছে	১৭০
কাজের মানুষ	১৭২
কাজের লোক	২৮৯
কানে খাটো বংশীধর	২২২
কাপড়ের কথা	৪৭
কালা	২৩৫
খুকীর লড়াই দেখা	২৭
খোকাখুকীদের বাগান	১২৯
খোঁড়া সুধীর	১০

বিষয়	পৃষ্ঠা
পৃষ্টবাহন	৩৬৩
গর্গনের মুণ্ডু	২,৩৪
গল্প সল্প	৯০,১২৬
গান	৩০
গৌতম ও মণিকুণ্ডল	৬৬
গৌতমের তপস্যা	১৮
গ্রীষ্ম	১
ঘুমটি দিয়ে যা	১৬১
ঘুড়ি ও ফানুষ	৩৭৮
চার বিপ্তে	২৪৯
চুপ রও	৩৬৮
ছয় বীর	২৪৯
ছাপাখানার কথা	২৩
ছোট গল্প	১৯০, ২১৩
জগাদাসের মামা	১১৯
জানোয়ার-ওয়ালা	২০৮
জানোয়ারের প্রবাস যাত্রা	৩৭৩
জাহাজ তৈয়ারী	২৮
জ্বালাতন আর কি!	২০৭
ডাকঘরের কথা	২৪৬

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
ডেভিড্ লিভিংষ্টোন্	১৩	বাঘ মামা	৪০
তিন বন্ধু	৩১৬,৩৩৩	বাদল গান	৯৭
দানের পুণ্য	১৫৯	বিশ্বামিত্র	১৯৪
দুষ্টু দরজি	৮৩	ভাঙা তারা	২৯৯
দ্রিঘাংচু	২১২	মস্ত ভূত	২৮১
ধাঁধার উত্তর	৬০,৯৬,১২৮,১৬০,১৯২, ২২৪,২৫৬,২৮৩,৩২০ ও ৩৫২	মহাদেব ও হনুমান	২৬৫
		মা ও ছেলে	৩২১
নিরেট গুরুর কাহিনী	১৩৪, ১৯৯, ২৩১, ২৫৮, ২৯১, ৩১২	মাটির বাসন	৩৪৫
		মায়া দুর্গ	৩৩৬
নিরেট গুরুর মৃত্যু	৩৫৪	রঙিন ছবি	২১৬
নীহারিকা	৩১৯	রাজার ছেলে	৪৪
নূতন ধাঁধা	৬০, ৯৬, ১৫৯, ২২৪,২৫৬,২৮৮,৩২০	রাজার ছেলে পীতাম্বর	৭৫,১০৮
নূতন পণ্ডিত	৯২,১২৮	রাজার বন্ধু	২৭৬
পড়ার ঠেলা	৩৩	রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞ	২৯৪,৩২৪
পড়ার হিসাব	২২৫	রামের শঙ্খ	১৪৭
প্রভাতে	২৫৭	রাক্ষসে মাকড়সা	২৩৭
পাকা রাঁধুনী	১০৭	রেল গাড়ীর কথা	১১৫
পাখীর ছানা	৭৯	লাল রং	৩১৯
পাগলা দাশু	৩০৫	লোভী ছেলে	১৯৩
পাড়া আর ঢিল	২২৩	শিবিরাজের পরীক্ষা	১১৯
পারিজাত হরণ	১৬৮	শুক্রাচার্য্যের তপস্যা	২১৬
পার্লামেণ্টের ঘড়ী	৮৬	শ্বেত ব্রাহ্মণের উপাখ্যান	৯৯
পাস্তুর	৫৩	সক্রেটিস্	৭০
পুণ্যের হিসাব	১৭৯,২০২	সন্ধ্যাতারা	৬৫
পুরাতন চিঠি	৩০৩	সব চেয়ে উঁচু	১৮৭
পুরাতন লেখা	২৮৪,৩৪২,৩৭২	সাবধান	২৫৪
পেকার	১২১	সিন্ধু ঈগল	৩৬১
পেটুক রামু	৩০২	সিরবালা	১৪৩
ফড়িং	১১৩	সীতার অভিশাপ	১৭২
ফ্লরেন্স নাইটিঙ্গেল	১৩৮	সূর্য্যের কথা	১৫২
ফুলের সাজি	৮	সেকালের বাঘ	১৫৬
বনের খবর	৮৮	সেকালের বাদুড়	৩৪৯
বর্ণ পরিচয়	২৬,৬১	হাইদর	২৮২
বর্ষ শেষ	৩৫৩	হিতে বিপরীত	১৮৬

হিপ্পপটেমাসের হাঁ ... ২৭৫

ছেলেমেয়েদের সুন্দর উপহারের বই।

গল্পের বই

(তৃতীয় সংস্করণ)

(শ্রীমতী সুখলতা রাও প্রণীত)

১৬ খানি সুন্দর হাফটোন ছবি ; ১ খানি রঙ্গিন ছবি ; রঙ্গিন মলাট।

মূল্য ॥০ আনা মাত্র ; ভি-পিতে ॥৵০ আনা।

প্রবাসী বলেন :—যেমন গল্পগুলি কৌতুককর, গল্পের ছবিগুলিও তেমনি সুন্দর ও কৌতুককর হইয়াছে। এরূপ চিত্র বাংলা গ্রন্থে খুব অল্পই আছে।

কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে ও নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাওয়া যায় :—

সন্দেশ কার্য্যালয়,

২১-২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, পোঃ- -সিমলা, কলিকাতা

একখানি সুন্দর উপহারের বই

৺উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রণীত

ছোট্ট রামায়ণ

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

সরল পদ্যে মধুর ছন্দে রামায়ণ। ১৬ খানি সুন্দর পৃষ্ঠাব্যাপী হাফটোন ছবি। ৪ খানি রঙ্গিন ছবি ও রঙ্গিন মলাট। এণ্টিক কাগজে ছাপা।

মূল্য ॥০ আনা মাত্র, ভি-পিতে ॥৵০ আনা।

কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে ও নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাওয়া যায়।

সন্দেশ কার্য্যালয়।

২১-২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

তাপসী

মীরাবাই, সেণ্ট এলিজাবেথ, রাণী শরৎসুন্দরী প্রভৃতি দশটি বরণীয়া নারীর জীবনচরিত।

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত প্রণীত। সুন্দর ছবি আছে।

কাগজের মলাট ১৲ টাকা, কাপড়ের বাইণ্ডিং ১।০ পাঁচসিকা।

গিরিডি গ্রন্থকারের নিকট, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সে, কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে এবং সন্দেশ কার্য্যালয়ে পাওয়া যায়।

টেক্সট (Text) বুক কমিটি কর্ত্তৃক অনুমোদিত শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত এম,এ, প্রণীত

বালক বালিকার শিক্ষার অফুরন্ত ভাণ্ডার

রামায়ণের কথা পুরাণ কথা

সুন্দর বাঁধাই, সুন্দর সুন্দর ছবি, প্রায় ২০০ পৃষ্ঠা, প্রত্যেকের মূল্য ॥৵০

সরল চণ্ডী

২য় সংস্করণ ১৫ খানা—প্রসন্ন ও রঞ্জন প্রণীত মূল্য সুন্দর বাঁধাই, ৸০

১। গল্পচ্ছলে বীর রাজপুত জাতির অপূর্ব্ব ইতিহাস—

রাজপুতকাহিনী

২য় সংস্করণ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠা, সুন্দর সুন্দর ছবি, ঝক্‌ঝকে বাঁধাই ১।০

২। দশটী মনোরম সচিত্র উপন্যাস সমষ্টি—

লহর

মা জননীদের হাতে দিতে, বন্ধুপত্নীকে উপহার দিতে "লহর" প্রকৃতই অমূল্য রত্নলহর, মূল্য ১৲

৩। সর্ব্বজন প্রশংসিত উপন্যাস কোহিনুর—

ছোট বড়

প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠা, ঝক্‌ঝকে বাঁধাই, মূল্য ১॥০

প্রকাশক—সাহিত্য-প্রচার সমিতি লিমিটেড্—

২৪নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা ও সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

১০০নং গড়পার রোডস্থ ইউ, রায় এণ্ড সন্সের ছাপাখানায় শ্রীললিতমোহন গুপ্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং ১১।২নং সুকিয়া ষ্ট্রীট "সন্দেশ" কার্য্যালয় হইতে শ্রীললিতমোহন গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

মর্ম্মগাথা।

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য প্রণীত।

চশ্‌মা, নস্যি, চা, চাকরি, মশা ছারপোকা প্রভৃতি
হাসির গান সম্বলিত সাঁইত্রিশটি
নানান্ ভাবের নানান্ রসের নূতন নূতন কবিতা।

প্রবাসী, ভারতবর্ষ, নব্য ভারত, মবাণী, বেঙ্গলী, অমৃত বাজারে উচ্চ প্রশংসিত।

ধবধপে কাগজ, টগ্‌বগে ভাব, ঝরঝরে ভাষা।

মূল্য পাঁচ আনা মাত্র।

কলিকাতার সকল প্রসিদ্ধ পুস্তক বিক্রেতার নিকট পাওয়া যায়।

রায়-সাহেব ডাঃ কে, সি, দাসের

স্বাস্থ্য সহায়।

যদি শরীর সুস্থ ও সবল রাখিয়া সাংসারিক সুখ উপভোগ করিতে চান তবে প্রত্যেক স্ত্রী পুরুষের অবশ্য জ্ঞাতব্য, দৈনিক আবশ্যকীয় অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ পাঠ করুন। ইহা বিনা মূল্যে ও বিনা মাশুলে বিতরণ হইতেছে।

স্বাস্থ্য সহায় ঔষধালয়, ৩০।২নং হ্যারিসান রোড, কলিকাতা।

১৩২০ সালের বাঁধান সন্দেশ।

প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠার বই। ১৪ খানি রঙ্গিন ছবি, প্রায় ১০০ খানি হাফটোন ছবি, সুন্দর বাঁধাই। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দেবী, শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী, শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র নাথ সরকার প্রভৃতির লেখা ১৩২০ সালের সন্দেশে বাহির হইয়াছে। উপহারের উৎকৃষ্ট পুস্তক। মূল্য ১৷৷০ টাকা মাত্র।

"সন্দেশ" কার্য্যালয়।
২১-২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সাবিত্রী

শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র দাস গুপ্তের (তৃতীয় সংস্করণ)

তের মাস পরে অপূর্ব্ব সাজে বাহির হইয়াছে।

সিন্দুরে বর্ডার, তার মাঝে সাগর-জলী লেখা, তার উপর রামধনু রংএর ছবি!

কার্ত্তিক বাবুর লেখার বিশেষতঃ পুরাণ কথার আদি রঙ্গিন বই, এই সাবিত্রীর, নূতন পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। ৫ বছরে ৭০০০ বইর কাটতী কম্ নয়! দীনেশচন্দ্র বলেন "চমৎকার", অবনীন্দ্র বলেন "অতি মনোরম", রবীন্দ্রনাথ বলেন "উপযোগী"।

মূল্য সেই ছয় আনা

প্রকাশক

ফ্রেণ্ড এণ্ড কোং

৬৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীমতী সুখলতা রাও প্রণীত নূতন বই

"পড়া শোনা"

ছাপা হইতেছে। ছেলেমেয়েদের বাংলা বর্ণমালা শিক্ষার এমন সুন্দর বই আর নাই। সম্পূর্ণ নূতন ও অতি সহজ উপায়ে বর্ণমালা শিখাইবার প্রণালী এই পুস্তকে থাকিবে। অনেকগুলি সুন্দর ছবিও থাকিবে।

প্রকাশক :—ইউ, রায় এণ্ড সন্স্

১০০ নং গড়পার রোড, কলিকাতা।

"রবিন হুড" ও "ওডিসিয়ুস" প্রণেতা

শ্রীযুক্ত কুলদারঞ্জন রায় প্রণীত

"ইলিয়াড"

ছাপা হইতেছে,—শীঘ্রই বাহির হইবে। সুন্দর লেখা—সুন্দর ছবি।

মূল্য ।০ আনা মাত্র।

৬৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট, সিটি বুক সোসাইটিতে, "সন্দেশ" কার্য্যালয়ে ও প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে পাওয়া যাইবে।

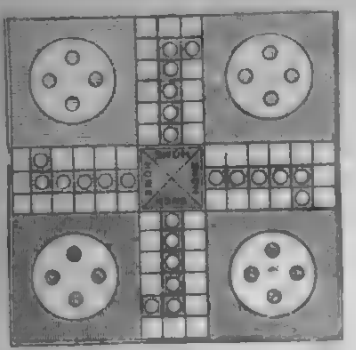

মজার খেলা।

লুডো ॥৵০ ও ১৲
ওয়ার্ড-মেকিং ॥০ ও ১৲
শরীর গঠন যন্ত্র।
চেষ্ট একস্‌পাণ্ডার—২॥০, ৩৲ ও ৩॥০
ডিভেলপার—১০॥০ ও ১১॥০

প্রাপ্তিস্থান—

ঘোষ এণ্ড সন্স।

৬৮নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

১৩২১ সালের বাঁধান "সন্দেশ"

১৪ খানি সুন্দর রঙ্গিন ছবি ; ১০০রও অধিক হাফটোন ছবি ;
৩৮৪ পৃষ্ঠা। অনেক কবিতা, অনেক গল্প, ধাঁধা,
মজার কথা। সুন্দর রঙ্গিন মলাট।

মূল্য ১॥০ টাকা ; ভি-পিতে ১॥৵০ আনা।

সন্দেশ কার্য্যালয়ে পাওয়া যায়।

For High-class Bromide Enlargements and Oil-Paintings—

K. RAY, Artist.
100, Gurpar Road, Calcutta.

ভারতে এই প্রথম

কুমারী-মাকড়ী

এই ডিজাইনের মাকড়ী এই পর্যন্ত কেহ ভারতে প্রস্তুত করিতে পারে নাই। এত কম মূল্যে বিনা পানে গিনি স্বর্ণের মাকড়ী কেহ কখনও ক্রয় করা দূরে থাকুক, ইহা যে প্রস্তুত হইতে পারে সহজে বিশ্বাস হয় না। হাই পালিশ। গৃহস্থ ব্যক্তির প্রত্যেক বালিকাকে এক এক জোড়া কিনিয়া দিতে কষ্ট হইবে না। মূল্য ৩৸০ টাকা মাত্র। মাশুলাদি ।৶০ আনা

মণিলাল এণ্ড কোং।

জুয়েলার্স এণ্ড ডায়মণ্ড মার্চ্চেণ্টস্

১০ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

টেলিগ্রাম—নেকলেস্

টেলিফোন নং ১৭০৪

নূতন বই! নূতন বই!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী বি-এ, প্রণীত

অনাথ

ছেলেমেয়েদের উপযোগী উপন্যাস।

ছেলেমেয়েদেরই কাহিনী। মূল্য এক টাকা।

ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস

২২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সন্দেশ কার্য্যালয়ের ঠিকানা

অনেকে ১০০ নং গড়পার রোড লিখিয়া থাকেন। উহার ঠিকানা—

২১-২ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ঘোষ এণ্ড সনস্

গহনা ঘড়ি এবং চশমা বিক্রেতা।

৭৮।১ হারিসন রোড ;

ব্রাঞ্চ—১৬।১ রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সকল রকম গহনা, টাইমপিস্, ওয়াচ, ক্লক, বিক্রয় ও মেরামত হয়। পত্র লিখিলে কাট্যালগ পাঠান যায়।

সুন্দর উপহারের বই

শ্রীবিমলা দাসগুপ্তা বিরচিত

"নরওয়ে ভ্রমণ"

সুখপাঠ্য ভ্রমণ বৃত্তান্ত। বিষয়বৈচিত্র্যে ও বর্ণনা মাধুর্য্যে অতীব চিত্তাকর্ষক। চির-তুষারের দেশে নিশীথ সূর্য্যের আবির্ভাব। প্রকৃতির কৌতুকখেয়াল। দুইখানি সুন্দর রঙ্গিন ছবি ও অনেকগুলি হাফটোন ছবি। সুন্দর বাঁধাই।

মূল্য ১৲ টাকা।

SISIR K. DUTT. Publisher.

25, Sukeas Street, Calcutta.

একখানি সুন্দর শিশুপাঠ্য পুস্তক

মহাভারতের গল্প

স্বর্গীয় উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রণীত

মহাভারতের অবান্তর গল্পগুলি লইয়া এই পুস্তক লিখিত হইয়াছে। একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া ছাড়া যায় না। ৮ খানি হাফটোন ছবি ও ১ খানি রঙিন ছবি; সুন্দর কাপড়ে বাঁধাই।

মূল্য ১।০; ভি, পিতে ১৷৶০ আনা।

প্রবাসী বলেন :—গ্রন্থের ভাষা দিব্য লঘু ও সরস, বর্ণনায় কবিত্ব আছে। গল্পগুলি বিবিধ বিষয়ের, বিবিধ শিক্ষা ও বিবিধ রস প্রকাশ করিতেছে। বালক বালিকা কেন, বয়স্কদিগেরও অবসর বিনোদের সুন্দর পুস্তক। ইহাতে * * একখানি বিবিধ বর্ণে মুদ্রিত বৃত্রাসুরের ছবি, ছেলেদের পরম আগ্রহ ও আনন্দের সামগ্রী।

৬৪নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, সিটিবুক সোসাইটিতে, সুকিয়া ষ্ট্রীটে সন্দেশ কার্য্যালয়ে ও প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

ছেলেমেয়েদের জন্য

স্বর্গীয় উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রণীত

ছেলেদের মহাভারত।

(ষষ্ঠ সংস্করণ)

সরল, সরস ভাষায় মহাভারতের মূল গল্প। ৮খানি সুন্দর হাফটোন ছবি; একখানি রঙ্গিন ছবি। সুন্দর কাপড়ে বাঁধাই।

মূল্য ১।০ পাঁচসিকা, ভি, পি,তে ১৷৶০ আনা।

প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে ও সন্দেশ কার্য্যালয়ে পাওয়া যায়।

স্কুলের উপহারের বই।

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি মাননীয় ডিরেক্টার অভ্ পাবলিক ইন্‌ষ্ট্রাক্‌সন কর্ত্তৃক, ঢাকা, রাজসহী ও চট্টগ্রাম বিভাগের হাই স্কুল, মধ্য ইংরাজী স্কুল ও প্রাথমিক স্কুলের উপহারপুস্তক রূপে মনোনীত হইয়াছে :—

(১) ছেলেদের রামায়ণ ৺উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রণীত ॥০ আনা

(২) ছোট্ট রামায়ণ " "

(৩) টুনটুনির বই " "

(৪) ছেলেদের মহাভারত " কাগজের মলাট ১৲

কাপড়ে বাঁধা ১।০

(৫) মহাভারতের গল্প " কাপড়ে বাঁধা ১।০

(৬) গল্পের বই শ্রীমতী সুখলতা রাও প্রণীত ॥০ আনা।

প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে ও নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাওয়া যায় :—

সন্দেশ কর্য্যালয়,

২১-২ হুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

"সিরাপ বাকসে"র শিশি দেখে সবাই ছুটে এলে চলবে না। ফটিকের সর্দ্দি কাসি হয়েছে, সেই শুধু "বাকস" খাবে। খেতে মিষ্টি বলেই যদি সকলে চাও, তবে অসুখ হলে আমি কোথায় আর পাব। এ ত এখানে পাওয়া যায় না; সহর থেকে নয়ত কল্‌কাতা "বেঙ্গল কেমিক্যালে" চিঠি লিখে আন্‌তে হবে।

আজকাল সকল গৃহেই এক শিশি "বাকস্ সিরাপ" রাখা চাই।

এক শিশির দাম মাত্র ।৶০ দশ আনা।

বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড
ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্ লিমিটেড্
কলিকাতা

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্ম—১০ই নভেম্বর, ১৮৪৮] [মৃত্যু—৬ই আগষ্ট, ১৯২৫ ।